সেবকের নিবেদন।

অর্থাৎ

শ্রীনববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের

উপদেশ।

[চতুর্থ খণ্ড।]

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮১০ শক।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড, বিধান যন্ত্রে
শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী পত্র।

সেবকের নিবেদন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

জলসংস্কার।

রবিবার ৬ আষাঢ় ১৮০৩ শক।

উত্তপ্ত হিন্দুস্থান স্বভাবতঃ স্নানপ্রিয়। যে প্রদেশে সূর্য্যের নাম অগ্নি, সে প্রদেশে কোটি কোটি লোক যে নদীর দিকে ধাবিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যেখানে প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে লোক অস্থির হয়, সেখানকার লোকেরা নিশ্চয়ই জলের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। যেখানে নিয়ত অগ্নি বর্ষণ হইতেছে, সেখানে বারি বর্ষণ কেন না প্রার্থনার বস্তু হইবে। যাহারা প্রখর রৌদ্রে কষ্ট পাইতেছে এবং যাহারা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, তাহারা জলের মহিমা ও আদর জানে। এই জন্য হিন্দুর বীণা ইন্দ্রের মহিমা অথবা বৃষ্টির দেবতার গুণ গান করিয়াছে। এই জন্য ঋগ্বেদ বরুণের প্রতি স্তব স্তুতি করিয়াছে। এদেশের লোক চিরকাল প্রকৃতির ভিতরে জলের মহিমা দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছে। নরনারী সকলেই বিলক্ষণরূপে জলের মাহাত্ম্য অবগত

আছে। হিন্দুকে আবার স্নান অবগাহন শিক্ষা দিবে কে? যে হিন্দুভ্রাতা রৌদ্রে চিরজর্জ্জরিত, এবং নিত্যস্নান অবগাহন ভিন্ন যে হিন্দু সুস্থির থাকিতে পারে না, তাহাকে কি আবার জলাভিষেক শিক্ষা দিতে হয়? প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি ঈশা জলের দ্বারা জলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিষেকরীতি যে কেবল য়িহুদী দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে; ইহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল। যে সকল হিন্দু গঙ্গাস্নানের এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণরূপে অভিষেকের তত্ত্ব জানিতেন। এই জলাভিষেক-বাসনা হিন্দু-হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। অতএব অভিষেক রীতিকে আমরা বিজাতীয় বলিতে পারি না। এই রীতি অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয় নাই; কিন্তু এই অভিষেক হিন্দুজাতির প্রাচীন রীতি ও দেশাচার। এই পুনরুদ্দীপন দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন সদনুষ্ঠানকে আধুনিক নব-বিধানে স্থান দান করা হইল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশার পবিত্র জলাভিষেক হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদে পবিত্র জলের স্তব স্তুতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। নব-বিধানবাদীদিগের নিকটে দেশ ভেদ এবং কাল ভেদ নাই, সুতরাং ঋগ্বেদ এবং খৃষ্টবেদ উভয়ই নব-বিধানবাদীদিগের সম্পত্তি। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র পবিত্র স্নানবিধি

প্রচলিত। যেমন এই দেশে গঙ্গাস্নান পবিত্র অনুষ্ঠান, সেইরূপ পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশে সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীতে স্নানও পবিত্র। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদী হিন্দুদিগের নিকটে পবিত্র, এবং যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু তাঁহারা এ সকল নদী স্মরণ ও সাধন করিয়া পবিত্র স্নান দ্বারা আপনাকে শুদ্ধ করেন। ভারতবর্ষে নদীর অভাব নাই, ভারবর্ষময় নদী। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নদীতে বিভক্ত। সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত ভারতবর্ষে রাশি রাশি জলের প্রয়োজন, এই জন্য বিধি নিজেই অনেকগুলি নদী প্রণালীর ভিতর দিয়া ভারিতে প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতেছেন। এই জন্যই ভারতের আকাশ বর্ষাকালে সর্ব্বদা মেঘে পরিপূর্ণ থাকে। প্রাচীন আর্য্যগণ এই জলের নাম জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক জল আমাদিগের পরমোপকারী প্রাণের বন্ধু। জল ভিন্ন জীবন ধারণ করা অসম্ভব। এই জল আমাদিগের আহারের সামগ্রী সকল প্রস্তুত করে, এই জল আমাদিগের পিপাসা নিবারণ করে, এই জল আমাদিগের গাত্র প্রক্ষালন করে, এই জলে আমরা স্নান অবগাহন করিয়া শরীর শীতল করি। যে জলের নিকটে আমরা এত উপকার লাভ করি, সেই জলের পক্ষপাতী হইয়া তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। হে নব-বিধান-ভুক্ত ব্রাহ্ম, তুমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর যে তোমার ব্রহ্ম সর্ব্ব-

ব্যাপী, তবে তুমি কোন্ মুখে বলিবে যে জলে ব্রহ্ম নাই। যে জলের এত গুণ, যে জলের এত মহিমা, যে জলে আমাদিগের দেহশুদ্ধি, প্রাণরক্ষা, পিপাসা-নিবৃত্তি এবং সুচারুরূপে বাণিজ্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সেই জলকে কি আমরা অবহেলা করিতে পারি? প্রাচীন আর্য্য কবি এবং যোগী ঋষিগণ যখন জলের আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং প্রতাপ দেখিলেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন আকাশ হইতে জল-বৃষ্টি বিন্দুরূপে উত্তপ্ত ভূমিখণ্ডের উপরে পড়িয়া উর্ব্বরা ভূমিকে সহস্রগুণে উর্ব্বরা করিতেছে, নদীসকলকে বর্দ্ধিত ও প্রবলতরঙ্গরূপে বেগবতী করিতেছে, গৃহস্থদিগের তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিতেছে, নানা প্রকারে প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন করিতেছে, তখন তাঁহারা জলকে অত্যন্ত মহৎ মনে করিয়া জলের উপরে দেবত্ব আরোপ করিলেন। তাঁহারা জলের একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিলেন এবং মনে করিলেন সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টির আকারে গৃহস্থদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আকাশ হইতে পড়িল বৃষ্টি, হইল ধান্যের সৃষ্টি ৷ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, আকাশ হইতে যত ফোঁটা জল পড়িল তত গুলি মোহর পড়িল, বৃষ্টিবিন্দুর আকারে তত গুলি মুক্তা পড়িল। ধান্যবন্ধু বৃষ্টি, ধান্য পোষণ করিয়া পৃথিবীকে প্রচুরধনে ধনী করে। এই বৃষ্টি অথবা জল আমাদিগের দেশে যে কেবল শস্য উৎপাদন করে তাহা নহে, জল আবার আমাদিগকে স্নিগ্ধ করে, আমাদিগের অঙ্গ

প্রস্তুত করে, তৃষ্ণা নিবারণ করে, জঞ্জাল পরিষ্কার করে, গাত্রশুদ্ধি করে। হে বৃষ্টি, তুমি ক্ষুধার অন্ন স্বজন করিলে, আবার পিপাসার জল তুমি বর্ষণ করিলে। জলের কত গুণ এক মুখে বলা যায় না। জল ভিন্ন হিন্দু কোন মতে শুদ্ধ হইতে পারেন না। জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধ না করিলে সাত্ত্বিক হিন্দু মনের আনন্দে ব্রহ্মপূজা করিতে পারেন না। ভালরূপে জল দ্বারা গাত্র প্রক্ষালন না করিলে হিন্দুর শরীরে জড়তা ও মলিনতা উপস্থিত হয়; এই জন্য প্রত্যুষ হইবা মাত্র সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী গঙ্গাস্নান করেন। কি বারাণসী কি প্রয়াগ, কি কলিকাতার গঙ্গাতীরে যদি প্রাতঃকালে যাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, গঙ্গার উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র হিন্দু অগাধ ভক্তি এবং মহা আনন্দের সহিত গঙ্গাস্নান করিতেছে। তাহাদিগের কেমন ভক্তির উচ্ছ্বাস! কত স্তব স্তুতির ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হয়, এবং প্রাতঃকালে গঙ্গা কেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মস্থানের আকার ধারণ করে! গঙ্গাতীরবাসী, গঙ্গাতীরবাসিনী হিন্দুগণ নিত্য গঙ্গাস্নান করাকে একটি মহাপুণ্যব্রত মনে করেন। হিন্দুশাস্ত্রে গঙ্গার কত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গাতীরবাসী হিন্দুপরিবারস্থ বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলেই গঙ্গা স্নান করে। প্রকৃত হিন্দু মনে করেন গঙ্গা স্নান দ্বারা যেমন গাত্রশুদ্ধি হয়, তেমনি চিত্তশুদ্ধিও হয়। বাস্তবিক জলকে পবিত্র মনে করা হিন্দুর স্বাভাবিক ভাব। সুতরাং জর্ডন

নদীতে ঈশার জলাভিষেকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুগণ জলাভিষেকের পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস করিতেন, গঙ্গা স্নান ভিন্ন যেমন উত্তপ্ত ও মলিন শরীর শীতল এবং নির্ম্মল হয় না, সেইরূপ মনের পাপ দুঃখও যায় না। তাঁহারা সরলান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, গঙ্গা জলাভিষেকে পাপের আগুন নির্ব্বাণ হয়। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অভিষেকের মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি জান বাস্তবিক জলেতে এমন কোন গুণ নাই যাহাতে মনের বিকার দূর হইতে পারে, তবে জলাভিষেক দ্বারা কিরূপে পাপ প্রক্ষালিত হইয়া নব-জীবনের সঞ্চার হইতে পারে? তোমরা সকলেই জান, স্বয়ং ভগবান্ জীবের একমাত্র পরিত্রাতা, তবে জল দ্বারা কিরূপে পরিত্রাণ হইতে পারে? তত্ত্বপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন 'জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।' অতএব অসাধারণ বিশ্বাস ও ভক্তিনয়নে যদি জলের মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখিতে পাও, তবে জলাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। হে ব্রহ্মভক্ত, যদি তুমি প্রতিদিন স্নানের সময় জলের মধ্যে সেই ভক্তহৃদয়-কমলবাসিনী কমলা, জননী লক্ষ্মীদেবী মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে দেখিতে পাও তবে তোমার স্নান কেবল শারীরিক স্নান হইবে না, কিন্তু তোমার স্নান স্বর্গপ্রদ, নব-জীবনপ্রদ জলাভিষেক হইবে। সেই জল স্পর্শ করিবার সময় তোমার

মনে হইবে যেন তুমি কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পদার্থ স্পর্শ করিতেছ। বাস্তবিক সর্ব্বমঙ্গলা লক্ষ্মী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং জলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সেই সর্ব্বব্যাপিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর অমৃত ক্রোড় জলের মধ্যেও প্রসারিত রহিয়াছে। বিশ্বাসী হিন্দুগণ গঙ্গার মধ্যে সেই ক্রোড়ের আভাস পাইয়া গঙ্গাকেই মা বলিয়া সম্বোধন করেন। হে ভক্ত, নির্ম্মল পূর্ণিমা রাত্রে যদি কখনও গঙ্গায় বেড়াইয়া থাক, তাহা হইলে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা দেখিয়া অবশ্যই বলিয়া থাকিবে, মা ভুবনমোহিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি সুন্দর লীলা প্রকাশ করিতেছেন! ভক্ত দেখিতে পান, যেমন এক দিকে আকাশের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না গঙ্গার বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তেমনি সেই অশেষ গুণনিধান হরির মুখ-চন্দ্রের মধুর হাস্য গঙ্গাকে আরও সুশোভিত করিয়াছে। "জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি," হে ভক্তগণ, তোমরা নগরে নগরে পথে পথে এই সঙ্গীত করিয়া বেড়াইয়া থাক; কিন্তু তোমরা যথার্থ বল দেখি, তোমরা কি বাস্তবিক জলের মধ্যে হরিকে দেখিয়াছ, তোমরা কি নদী বক্ষে কমলের মধ্যে সেই মা লক্ষ্মী মহাদেবীকে দেখিয়াছ? জল সেই বিশ্বজননীর প্রেমজলের প্রতিনিধি, জল ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম ছাড়া জল থাকিতে পারে না। জলের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি, জলের উপরে ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ। বহুকাল পূর্ব্বে উপনিষদে আমরা এই শ্লোক পাঠ করিয়াছি "যো দেবোহগ্নৌ

যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।" "যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।" ইহাতে বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রাচীন আর্য্যেরা জলের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিতেন। সুতরাং জর্ডান নদীতে ঈশার জলাভিষেক, এবং গঙ্গানদীতে মুনি ঋষিদিগের স্নান বিধির মিলন হইল। গঙ্গা ও জর্ডান দুই ভগীর মিলন হইল। পূর্ব্বতন হিন্দু ঋষিগণ এবং ইহুদী ঋষি খ্রীষ্ট সকলেই জলের মধ্যে যে হরি বর্ত্তমান, এই সত্যের সাক্ষ্যদান করিলেন। পূর্ব্বকার হিন্দুসাধকগণ গঙ্গাতে অবগাহন করিয়া বলিলেন, জলে ব্রহ্ম; ঈশাও জর্ডান নদীর জলে নামিয়া বলিলেন, এই জলে আমার স্বর্গস্থ পিতা এবং তাঁহার পবিত্রাত্মা আবির্ভূত। বর্ত্তমান সময়ের নববিধান-ভুক্ত ব্রাহ্মেরাও জলাভিষিক্ত হইয়া অভিষেক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সত্যের সাক্ষ্যদান করিতেছেন। হে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ, তোমরা চিরকাল জলের মাহাত্ম্য গান কর। যেমন তোমরা জল দ্বারা শরীরকে মলামুক্ত করিবে, তেমনি জলের মধ্যে হরি বর্ত্তমান আছেন, এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া জলা-ভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ করিবে। হরিবিহীন জলে নিরীশ্বর জলে কখনও তোমরা স্নান করিও না, হরিবিহীন জল কখনও তোমরা পান করিও না। জলাভিষেকমন্ত্র দ্বারা তোমরা জলকে আগে হরিময় করিয়া লইবে, অর্থাৎ জলের মধ্যে হরিকে বর্ত্তমান দেখিবে, পরে সেই শুদ্ধ পবিত্র জলে

আপনার শরীর মনকে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিবে। প্রতিদিন তোমরা ব্রহ্মজলে স্নান করিবে। তোমরা অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় এক দিনও এই গঙ্গাজলকে ঈশ্বর-বিহীন সামান্য জল মনে করিও না। ব্রহ্মবিহীন সামান্য জলে এক দিনও তোমরা স্নান করিও না। তোমরা ব্রহ্মসন্তান, তোমরা দ্বিজ, তোমরা বিপ্র, তোমরা জলমন্ত্রে দীক্ষিত; সুতরাং তোমাদিগের নিত্যস্নান নিত্য পবিত্র অভিষেকে পরিণত হইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার পুণ্যময় মধুময় সরোবরে স্নান করিতে বলিয়াছেন। হিন্দুস্থান নানা প্রকার পাপতাপে দীপ্তশি । হইয়াছে, এই প্রকার পবিত্র জলাভিষেক ভিন্ন হিন্দুস্থানের পাপসন্তাপ দূর হইবে না। যখন পাপসন্তপ্ত হিন্দুস্থান ঈশ্বরের পুণ্যসাগরে, প্রেমসাগরে, জ্ঞানসাগরে শান্তিসাগরে অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে, তখন হিন্দুস্থানের পাপজ্বালা নির্ব্বাণ হইবে। যেমন বাহিরের নির্ম্মল জলে ডুব দিয়া আমাদিগের শরীর পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তেমনি আমাদিগের আত্মা ব্রহ্মসমুদ্রে ডুব দিয়া পাপমুক্ত, মলামুক্ত হইয়া উঠে। যথার্থ জলাভিষেক ভিন্ন পবিত্রতা এবং শান্তি নাই। গৃহে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ অশান্তি, পরিবারে পরিবারে বিবাদ অশান্তি, গ্রামে গ্রামে বিবাদ, নগরে নগরে বিবাদ, দেশে দেশে বিবাদ, জাতিতে জাতিতে বিবাদ, যুদ্ধ কলহ। অতএব সকলে প্রেমতৈল মাখিয়া শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া ব্রহ্মের

শান্তি সমুদ্রে অবগাহন কর। পৃথিবীর সমস্ত অশান্তি কলহ নির্ব্বাণ হইবে, এবং ধরাতলে প্রেমরাজ্য শান্তিরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। অশান্ত মানবপরিবার প্রশান্ত হইবে। আর কেহই অশান্তিরূপ শুষ্ক মরুভূমিতে থাকিয়া প্রাণ হারাইও না, সকলে মিলিয়া অগাধ অতলস্পর্শ অসীম ব্রহ্মজলে প্রবেশ কর। সেখানে ভক্ত মীন হইয়া ইহকাল পরকালে অপার আনন্দ ও সুখশান্তি সম্ভোগ কর। জলাভিষেক ভিন্ন নবজীবনের সঞ্চার হয় না। হোমাগ্নি দ্বারা পাপে বিকৃত পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ মনুষ্য দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হয়, সেই ভস্মের উপরে যখন ব্রহ্মের কৃপাবারি বর্ষণ হয়, তাহার মধ্য হইতে নূতন দ্বিজাত্মা উত্থিত হয়। অনুতাপাগ্নিতে পাপপ্রবৃত্তি সকল ভস্মীভূত হয়, পরে ঈশ্বরের কৃপাভিষেক দ্বারা সেই ভস্মীভূত মনুষ্যের ভিতর হইতে দ্বিজাত্মা পুণ্যাত্মা বাহির হয়।

অবতারবাদ।

রবিবার ১৩ই আষাঢ় ১৮০৩ শক।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অবতারবাদ আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যেও অবতারবাদ আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অবতারবাদী। যে ব্রহ্ম ভূমা, মহান, যিনি আপনার মহিমাতে আপনি পূর্ণভাবে স্থিতি করেন তাঁহাকে মানুষ স্বীকার

করিল ; কিন্তু তাঁহাতে মানুষের সকল ক্ষুধা শান্তি হইল না, তাহাতে মনুষ্যস্বভাবের সকল অভাব মোচন হইল না, এই জন্য মানবমণ্ডলী কাতরস্বরে প্রার্থনা করিল ;—"হে পরমাত্মন্, হে ভূমা, মহান্ ঈশ্বর, যদি তুমি জগতের নিকটে অপ্রকাশিত এবং অলক্ষিত থাকিবে, তবে জীবের পাপ দুঃখ যাইবে কিরূপে ? তোমার অদর্শনে যে মানবকুল ভয়ানক মৃত্যু ও পাপগ্রাসে পতিত হইবে. অতএব হে ভগবন্, তুমি অবতীর্ণ হও, তুমি জগতের নিকট সাধুচরিত্ররূপে প্রকাশিত হও।" দুঃখী মানবজাতির এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়া জীবের দুঃখহারী ভগবান্ আপনার দয়াকে সঙ্গে লইয়া, প্রেমপক্ষ বিস্তার করিতে করিতে ধরাধামে অবতরণ করিলেন। কিন্তু এই অবতরণ দুই প্রকার। এক ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ, দ্বিতীয় তাঁহার পুত্রের প্রকাশ। হিন্দুধর্ম্মে অনেক অবতার, খ্রীষ্টধর্ম্মে একটি অবতার। পূর্ব্বদিকে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত এবং প্রচলিত এবং পশ্চিম দিকে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত, অবতারবাদসম্পর্কে, তাহাদিগের মধ্যে ভয়ানক বিভিন্নতা দেখা যায়। খ্রীষ্টবাদীরা যে ভাবে অবতারবাদী, হিন্দুরা সে ভাবে অবতারবাদী নহেন। অথচ হিন্দু এবং খ্রীষ্টান উভয়েই বিশ্বাস করেন অবতার ভিন্ন মোক্ষপথ জানা যায় না, জীবের সদ্গতি হয় না, বৈকুণ্ঠ লাভ হয় না। এসিয়া খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক, ইউরোপ খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক অবতারবাদী।

কিন্তু অবতার কিরূপে হয়? অবতার কি? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দান করিবে। কেহ বলিবে ঈশ্বর স্বয়ং রাজা অথবা ফকির, বৃদ্ধ অথবা গোপাল ইত্যাদি নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। তাহাদিগের মতে জীবের অভাব অনুসারে নিরাকার ঈশ্বর পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, প্রভু, বন্ধু, স্বামী, ভার্য্যা, তনয়, তনয়া প্রভৃতি নানা প্রকার সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; হিন্দুদিগের এক সম্প্রদায়ের মতে সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। বৃক্ষ লতা, জল, অগ্নি, বায়ু, ফল, পুষ্প, জীব, জন্তু, সমুদয়ই ব্রহ্ম। এ সকল ভ্রান্ত মতের মধ্য হইতে নববিধান মূল সত্য সংগ্রহ করেন। নব-বিধানবাদিগণ জানেন, নিরাকার ঈশ্বর কখনও সাকার হইতে পারেন না, স্রষ্টা কখনও সৃষ্ট হইতে পারেন না, তবে সাকার এবং সৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, সর্ব্বগুণাধার ঈশ্বর সকল শক্তির মূলশক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকেন। সাকার মনুষ্য কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ দেহধারী মনুষ্য, হিন্দু পৌত্তলিকদিগের এরূপ বিশ্বাস। মানবশিশুর ক্ষুদ্র তনুর মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ডপতি বসিয়া আছেন। শিশুর বাহু, শিশুর চরণ, শিশুর চক্ষু, শিশুর শ্রোত্র, শিশুর সমস্ত অঙ্গ কেবল ঈশ্বরের হস্তরচিত তাহা নহে, ঐ সমুদায় ঈশ্বরের হস্ত পদ। যত শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ততই

স্বয়ং ভগবান্ তাহার সঙ্গে আপনার লীলা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন তাহার জীবনে লীলা শেষ হইল তখন তাহার শরীর হইতে ভগবানের অন্তর্ধান হইল। হিন্দুরা এইরূপ ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, যখনই জগতে অসত্য বা অধর্ম্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ঈশ্বর সেই অসত্য অধর্ম্ম দূর করিবার জন্য এক এক জন অসাধারণ মানুষের আকারে অবতীর্ণ হইয়া আপনার লীলা সকল প্রকাশ করেন। পাপদৈত্য, পাপাসুর, রাবণদানব বধ করিবার জন্য সময়ে সময়ে এরূপ অবতারের প্রয়োজন হয়। অবতারের বাহ্যিক জীবন ঠিক্ মানুষের মত; কিন্তু অবতার সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত অলৌকীক ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া আপনার পরিচয় দান করেন। স্বয়ং ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মখণ্ড মনুষ্য-জীবনের মূলে থাকিয়া যখন পৃথিবীতে কার্য্য করেন তখনই অবতারের প্রকাশ হয়। হিন্দুদিগের অবতারবাদ মনুষ্য ও দেবতার সংযোগ নহে। মনুষ্যাকারে যে পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রকাশ অথবা লীলা, হিন্দুদিগের মতে তাহাই অবতার। অসীম শক্তিশালী ব্রহ্ম মনুষ্যাকারে স্থিতি করিয়া জীবোদ্ধারের জন্য যে সকল অলৌকিক অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই অবতারের কার্য্য। যাঁহারা ইহা জানেন না তাঁহারা হিন্দু নহেন। হিন্দুস্থানের অবতার-বাদ এইরূপ।

ইউরোপখণ্ডও অবতারবাদী, কিন্তু ইউরোপের অবতারবাদ হিন্দুস্থানের অবতারবাদের ন্যায় নহে। ইউরোপখণ্ড মহর্ষি ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করে। জেরুজেলাম এবং সমস্ত পৃথিবী যখন পাপদুঃখভারে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিল, তখন ভগবান্ জগতের দুঃখ বিমোচন করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় পুত্র ঈশাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। যেমন আর্য্যজাতি বিশেষ বিশেষ সঙ্কটের সময় ভগবানের অবতারের আশা করিয়াছিল, সেইরূপ সমুদয় য়িহুদী জাতিও ঈশ্বরের অবতারের শুভাগমনের জন্য আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াছিল। ঈশার জন্ম হওয়াতে য়িহুদীদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল। মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরের পুত্রভাবের পূর্ণ অবতার। সেই স্বর্গীয় উচ্চ পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ঈশার চরণে সমস্ত পশ্চিম ভূভাগ প্রণত হইল। দুই হাত তুলিয়া আমেরিকা খণ্ড এবং ইউরোপ খণ্ড বলিতেছে, "ঈশাকে স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মহীয়ান্ কর। ঈশাকে মানুষ বলিও না, ঈশাকে সামান্য সাধু অথবা ঋষি বলিয়া ক্ষান্ত হইও না, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জেরুজেলেম নগরের এক জন সামান্য সূত্রধরের পুত্র আপনার গুণে পৃথিবীকে ভয়ানক আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিও না। ঈশার প্রাণের ভিতরে থাকিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ আপনার লীলা

প্রকাশ করিয়াছিলেন।" তবে হিন্দুস্থানের অবতারের সঙ্গে ইউরোপখণ্ডের অবতারের প্রভেদ কি? হিন্দুদিগের মতে ভক্ত পালন এবং দুষ্ট দমন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের আকারে অবতার হন; খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডের মতে, ঋষি খ্রীষ্ট মধ্যে ঈশ্বর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। এ কথা নূতন কথা, ঈশার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ কথা কেহ শুনে নাই। হিন্দুদিগের মতে কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি স্বয়ং ব্রহ্ম, অথবা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার; কিন্তু য়িহুদীপ্রধান ঈশা স্বয়ং ভগবান্ নহেন, তিনি ভগবানের পুত্র। তবে খ্রীষ্টজগৎ যে ঈশ্বর এবং ঈশা এক অথবা স্বর্গীয় পিতা এবং স্বর্গীয় পুত্র অভিন্ন আত্মা, এই কথা বলেন ইহার গূঢ় অর্থ আছে। এই কথার মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করিয়া ইহার নিম্নস্থ মুক্তা উদ্ধার করিতে হইবে। বাস্তবিক ঈশ্বর এবং ঈশা এক ব্যক্তি নহেন; কিন্তু তাঁহারা দুই ব্যক্তি হইয়াও একপ্রাণ। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র ঈশা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মবাণীরূপে, অথবা ব্রহ্মকৃপারূপে ব্রহ্মে লুক্কায়িত ছিলেন। ঈশা ব্রহ্মবাক্য, ঈশা ব্রহ্মতনয়, সুতরাং ব্রহ্মেতে এবং ঈশাতে প্রভেদ নাই, কেন না সন্তানের স্বভাবে পিতার স্বভাব প্রতিবিম্বিত হয়; তনয়ের মুখে পিতার মুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতেও দেখা যায়, সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের সাদৃশ্য থাকে। সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা অনা-

স্থাসে বলিয়া দিতে পারেন, ইহারা অমুক ব্যক্তির সন্তান। এই যে পিতা পুত্রের মুখের সাদৃশ্য ইহার মধ্যে গভীর ধর্ম্ম-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ঈশা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশার মুখে ঈশ্বরের মুখের লাবণ্য ও লক্ষণ সকল প্রতিবিম্বিত। ঈশা তনয়-জীবনের আদর্শ হইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন, ঈশার প্রকাশে ঈশ্বরতনয়ের মর্য্যাদা প্রকাশিত হইল। জগৎ পুত্রের মুখে পিতার মুখ দেখিতে পাইল। ঈশ্বর ভূমা, মহান্, অনন্ত, বৃহৎ, তাঁহার পুত্র ঈশা ক্ষুদ্র; ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত দয়া, ক্ষমা ধৈর্য্যের আধার, ঈশা পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, দয়া, ক্ষমা ধৈর্য্যের আদর্শ অর্থাৎ পুত্রোপযোগী ভাবসমূহের আধার। পুত্রের স্বভাব চরিত্র পিতার স্বভাব চরিত্রের অনুরূপ। পিতা স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন পুত্রেতে, স্বয়ং পিতা পুত্রেতে বর্ত্তমান। যাঁহারা জায়াতত্ত্ব জানেন, যাঁহারা জায়া-শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা বলেন মনুষ্য আপনি জায়ার মধ্যে আত্মজ, অর্থাৎ তনয়রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব পুত্র কেবল পিতার সদৃশ নহেন; কিন্তু এক ভাবে পুত্র আবার পিতা, কেন না পিতা স্বয়ং পুত্ররূপে প্রকাশিত হন। পিতা যিনি তিনি স্বয়ং জীবিত থাকেন পুত্রের আকারে। সেইরূপে স্রষ্টা পিতা, জন্মদাতা পিতা পুত্রের আকারে আপনার মহিমা ও অসীম করুণা প্রকাশ করেন। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন

পুত্রের আকারে। তবে যিনি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা তিনিই কি পুত্র? না। পুত্র স্বয়ং পিতা নহেন, কিন্তু পুত্র পিতার ক্ষুদ্র সংস্করণ। পিতা এবং পুত্র দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কিন্তু স্বভাব চরিত্রে অথবা স্বরূপতঃ তাঁহারা এক। পুত্রকে স্রষ্টা ঈশ্বর বলা পৌত্তলিকতা এবং ভয়ানক পাপ। নববিধানবাদী এই পাপে কলঙ্কিত হইতে পারেন না। ঈশ্বর স্রষ্টা খৃষ্ট তাঁহার সৃষ্ট পুত্র. স্রষ্টা ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, সৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন। যে বলে খৃষ্ট স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, সে ভয়ানক পৌত্তলিক। খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র. খৃষ্টের জীবনে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার লক্ষণ সকল বিশেষরূপে প্রতিফলিত, এই জন্য খৃষ্ট বিশেষরূপে ঈশ্বরের অবতার। খৃষ্ট পিতৃভক্তি ও বাধ্যতার যেরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবী অন্য কাহারও জীবনে দেখে নাই। ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তান মহর্ষি ঈশার যেরূপ গূঢ় প্রাণগত যোগ হইয়াছিল সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। যতই আমরা ঈশার নিগূঢ় জীবন দেখিতে পাই, ততই আমরা তাঁহাকে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে একপ্রাণ দেখিয়া বিমোহিত হই। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশার বিভিন্নতা দেখিতাম, তাহা হইলে ঈশাকে আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরের অবতার না বলিয়া ঈশাকে আমরা ঈশ্বরের শত্রু বলিতাম। ঈশার মুখে আমরা বিশেষরূপে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের মুখের

সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া সম্মাননা এবং শ্রদ্ধা করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মুখের ছাঁচে তাঁহার সন্তানের মুখ গঠন করিয়াছেন। এখানে শারীরিক মুখের কথা বলা হইতেছে না, কেন না ঈশ্বর নিরাকার এবং নিরবয়ব। ঈশ্বর চিন্ময় আত্মস্বরূপ, সুতরাং তিনি তাঁহার আত্মার মুখের ছাঁচে অর্থাৎ তাঁহার আত্মার অনুরূপ তাঁহার সন্তানকে সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং অনন্ত জীবন এবং সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার সন্তানকেও তিনি স্বর্গীয় জীবনের অধিকারী এবং নানাশক্তিবিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি চিন্ময় করিয়া গঠন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে প্রেমস্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি প্রেমিক ও ভক্তিমান্ করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মরাজ এবং পুণ্যস্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি ধর্ম্মশীল করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, তিনি নিজে পূর্ণানন্দ এবং নিত্যানন্দ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি তাঁহার অসীম সুখশান্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন। এইরূপে পরমাত্মার এবং জীবত্মার এক একটি স্বরূপ ও লক্ষণ দেখিলে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর এবং মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে গূঢ় যোগ ও ঐক্য রহিয়াছে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বিশেষ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক স্বভাবের মিলন আছে বলিয়াই মনুষ্যাত্মাকে ঈশ্বরের পুত্র

বলা যায়। মনুষ্যাত্মার সঙ্গে যদি পরমাত্মার সৌসাদৃশ্য না থাকিত তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যের পিতা না বলিয়া, তাঁহাকে কেবল মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতাম। সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, পশু, পক্ষী, নদ, নদী পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদয় পদার্থেরই স্রষ্টা; কিন্তু তাঁহাকে কেহই এ সকল জড় পদার্থের অথবা আত্মা বিহীন জীবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ঈশ্বর কেবল মনুষ্যের পিতা, কেন না মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে তাঁহার আত্মার সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আর সকল তাঁহার সৃষ্ট, কিন্তু তাঁহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু মনুষ্যই তাঁহার প্রকৃতিবিশিষ্ট। মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান; কেন না মনুষ্য স্বভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশা এই তনয়ত্বমত প্রচার করেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বর্গীয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানবাসীরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন পিতা স্বয়ংই পুত্রেতে জন্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ পিতা এবং পুত্রেতে কোন প্রভেদ নাই। এই গূঢ় তত্ত্বানুসারে স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার পুত্র ঈশার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া জেরুজেলাম নগরে সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনাকে পুত্রের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলের। ঈশ্বর আপনি তাঁহার পুত্রের মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া আপনার মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া-

ছিলেন, এই জন্য ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশাকে দর্শন করিবার জন্য নানাদিক হইতে লোক সকল আসিয়াছিল। বিশ্বাসী ভক্তগণ ঈশ্বরতনয়কে দেখিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই ঈশ্বর আপনার পুত্রের মুখে, আপনার মুখ আঁকিয়া দিয়াছেন।" পিতা ঈশ্বর অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শক্তির আধার, ছোট ছেলে অল্পশক্তিবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম জ্ঞানের আকর, ছোট ছেলে অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম প্রেমের সমুদ্র, ছোট ছেলে ক্ষুদ্র প্রেমের নদী। বড় পিতা অনন্ত পুণ্যের সূর্য্য, ছোট ছেলে অল্প পুণ্যের প্রদীপ। অতএব পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান্ বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না; কিন্তু জীবাত্মাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান্ ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ও ভগবান্ ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অবতারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতারবাদের যথার্থ অর্থ।

ভয় এবং প্রেম।

রবিবার, ২০এ আষাঢ়, ১৮০৩ শক।

পৃথিবীতে যখন প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন ভয়ের তিরোভাব হয়। য়িহুদীদিগের ভয়শাস্ত্র যখন শেষ হইল,

তখন ঈশার প্রেম-শাস্ত্র বিরচিত হইল। যখন ভয়ের পুরাতন বিধান সমাপ্ত হয়, তখন প্রেমের নূতন বিধান সমাগত হয়। এক দেশে অথবা এক সময়ে ভয় ও প্রেম উভয়ে একত্র পরস্পরের পার্শ্বে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতে পারে না। যখন এক জন রাজ্য শাসন করে, তখন আর এক জনকে সিংহাসন ত্যাগ করিতেই হইবে। যত দিন ভয়ের রাজ্য তত দিন প্রেম দূরে, এবং যখন প্রেমের রাজ্য আরম্ভ হয় তখন ভয় দূর হয়। প্রেমের ধর্ম্ম সাহসের ধর্ম্ম। ভয়ের ধর্ম্ম ভীরুতা বৃদ্ধি করে। প্রেমের ধর্ম্মে ভীরুতা স্থান পায় না। ভয়ের ধর্ম্মে নিয়মের ভয় বিধির ভয়, শাসনের ভয়, দণ্ডের ভয়। প্রেমের ধর্ম্মে ভয় নাই, যাঁহারা প্রেমের অধীন তাঁহারা নির্ভয় এবং সাহসী। যত দিন মনুষ্যের অন্তরে প্রেমোদয় না হয়, তত দিন সে ভয়ের অধীন। এই জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য এবং প্রত্যেক জাতি বাল্যাবস্থায় নানা প্রকার নিয়মও ভয়ের দ্বারা শাসিত হয়, পরে যখন বয়োপ্রাপ্ত হয় তখন প্রেমের দ্বারা চালিত হয়। যখন প্রেমের সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তখন ভয়ের ভীষণ আকৃতি সকল পলায়ন করে। প্রতিমনুষ্যের জীবনে কিংবা প্রত্যেক জাতির জীবনে ক্রমে ক্রমে প্রেমসূর্য্য সমুদিত হইয়া ভয়ের অন্ধকার নাশ করে। যখন প্রেম-সূর্য্যের উদয় হয়, যখন সাধকের মনে প্রগল্‌ভ ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন আর ভয় থাকিতে পারে না। প্রকৃত ব্রহ্মভক্ত, যথার্থ

ঈশ্বর প্রেমিক, ভয়ের অতীত। পূর্ণ প্রীতি ভয়কে বিনাশ করে। যাঁহারা পূর্ণপ্রীতি এবং প্রগলভা ভক্তির সহিত প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারা নির্ভয়। নববিধান পূর্ণ প্রেমের ধর্ম্ম। নববিধানসূর্য্যের অভ্যুদয়ে ভয়বিভীষিকার ধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছে। নববিধানের ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের আধার। নববিধানের দেবতা কখনও প্রেম-শূন্য হইয়া তাঁহার কোন সন্তানকে পরিত্যাগ কিংবা অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহার অনেক কুসন্তান আছে, কিন্তু কেহই তাঁহার ত্যাজ্য সন্তান নহে। তিনি স্বয়ং পূর্ণপ্রেমস্বরূপ, তাঁহার প্রেমের বিকার কিংবা পরিবর্ত্তন নাই। যাঁহারা এই নববিধানের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, কোন বিপদ দুর্ঘটনা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। যাঁহারা এই যথার্থ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহারাই নানাপ্রকার ভয়ে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রহ্মবাদী গুরু বলিলেন ;—"হে সাধক, তুমি নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" এই উপদেশ শ্রবণ মাত্র দুর্ব্বল সাধক ভয়ে বিকম্পিত হইল এবং নিরাকার ভাবিতে গেলে পাছে অন্ধকার দেখিয়া আরও ভয় পাইতে হয়, এই আশ-ঙ্কায় ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া, পৌত্তলিক-তার শরণাগত হইল, কেননা সাকার পুতুল পূজা এবং সাকার পুতুল ধ্যান করা সহজ। দুর্ব্বল মনুষ্যের পক্ষে নিরাকারব্রহ্মধ্যান অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য

নিরাকারব্রহ্মধ্যানের কথা শুনিয়া দুর্ব্বল সাধকেরা পৌত্ত-লিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং কাশী, বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু দুর্ব্বল সাধকেরা যেমন নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে ভয়ে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, তেমনি আবার অপ্রে-মিক ভীরু ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকতার ভয়ে পৌত্তলিকতার মধ্যে যে সকল সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব রহিয়াছে, সে সমস্তও পরিত্যাগ করিল। এক ভাবে এই প্রথম অবস্থার ভীরু ব্রাহ্ম পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কেন না ইহাঁরা এক নিরীশ্বর জগৎ কল্পনা করেন, ইহাঁদিগের মতে সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর নাই; ইহাঁরা বলেন *চন্দ্র, সূর্য্য, সাগর, পর্ব্বত, পুষ্প লতাদির মধ্যে ঈশ্বর আছেন* মনে করা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা। এ সকল ভীরু ব্রাহ্ম বলেন;—"পৌত্তলিকতা ছাড় এবং পৌত্তলিকতার মধ্যে সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, ইষ্টদর্শন, ইষ্টবাণীশ্রবণ, নৃত্য, গীত, উন্মত্ততা যাহা কিছু আছে সমস্ত ছাড়।" কে এই কথা বলিতেছে? ভয়দেবতা। প্রেমিক সাহসী ব্রাহ্মেরা এই ভয়কে ঘৃণা করেন। তাঁহারা ভীরুতা পরি-ত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকদিগের মধ্যেও ঈশ্বরের যে সকল ঐশ্বর্য্য আছে কৃতজ্ঞহৃদয়ে এবং ভক্তির সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা সাহসমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা নির্ভয়ে সকল স্থান হইতে ঈশ্বরের ভাব ও সত্য সকল

সংগ্রহ করেন। তাঁহারা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন না। তাঁহারা বলেন, "আমাদিগের ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল দেশের সকল জাতির ঈশ্বর। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মাবলম্বীর পিতা, তিনি সর্ব্ব ঘটে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাম, কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি সকলের অন্তরাত্মা। তিনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট প্রভৃতি সমুদয় জীবের জীবন। তিনি নদীর মধ্যে, তিনি বৃক্ষের মধ্যে, তিনি গরুর মধ্যে, তিনি পুতুলের মধ্যে, তিনি সর্ব্ববস্তুতে বিরাজমান।" প্রেমিক ব্রাহ্মের মুখে এ সকল সাহসের বাক্য শুনিয়া ভীরু দুর্ব্বল ব্রাহ্ম "ভয়ানক পৌত্তলিকতা ভয়ানক পৌত্তলিকতা" চীৎকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিল। ভীরু ব্রাহ্ম সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দেখিতে ভয় করে। অল্পবিশ্বাসী ভীত ব্রাহ্ম সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত দেখিতে পায় না। তাহার মতে সংসারে ঈশ্বরের বৈকুণ্ঠ নাই; সাংসারিক কোন ব্যাপারের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই, সংসার ঈশ্বরবিহীন, সংসারে মানুষ আপনি আপনার কর্ত্তা। বাস্তবিক অল্পবিশ্বাসী ভীরু ব্রাহ্ম নাস্তিকের ন্যায় এক নিরীশ্বর জগতে বাস করে। তাহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে হরি নাই; জলে হরি নাই, স্থলে হরি নাই, অনলে হরি নাই, অনিলে হরি নাই, চন্দ্রে হরি নাই, সূর্য্যে হরি নাই। তাহার অন্ধ অবিশ্বাসী চক্ষে সমস্ত সৃষ্টি হরিশূন্য। সে সর্ব্বদাই পৌত্ত-

লিকতার ভয়ে সশঙ্কিত। যখনই সে দেখিতে পায় যে কেহ কোন সৃষ্ট বস্তুর নিকটে প্রণত হইতেছে তখনই সে ভয়ে অবসন্ন হয়। সে ভয় এবং দুঃখের সহিত বলে "কেন লোকে গঙ্গার বন্দনা করে? কেন তাহারা স্নানের পর সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করে? কেন তাহারা বৃক্ষ পূজা করে? শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইয়া জড়পূজা? কি কলঙ্ক!!" এ সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভয়ে অবসন্ন হইয়া পৌত্তলিকতার দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধির নৌকারোহণ করিয়া এক কল্পিত ব্রহ্মবিহীন জগতে প্রবেশ করে। সে মনে করে সেখানে পৌত্তলিকতার কোন ভয় নাই। সেখানে একটি বৃক্ষ নাই, যাহাতে হরি আছেন, সেখানে একটী নদী নাই যাহাতে হরি আছেন, সেখানে একটী জীব নাই যাহার মধ্যে হরি অবস্থিতি করেন. সেখানকার সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ হরিবিহীন। হরি-বিহীন দেশ, হরিবিহীন নগর, সেখানে কোন প্রকার পৌত্তলিকতার বিভীষিকা নাই। সেই রাজ্যে বস্তুপূজা নাই, জীবপূজা নাই। অনায়াসে সেখানে নিরাকার ব্রহ্মপূজা কর। অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম এইরূপে পৌত্তলিকতার ভয়ে নাস্তিকতা অথবা মিথ্যা কল্পনার পথ অবলম্বন করে। অল্পবিশ্বাসীর এরূপ অধোগতি দেখিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিব, না দয়া সংবরণ করিব? যেখানে ভয়ে পলায়ন, সেখানে প্রেম নাই। ভীরু অপ্রেমিক ব্রাহ্ম পৌত্ত-

লিকতার ভয়ে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু সাহসী প্রেমিক ব্রাহ্ম সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু মধ্যে হরির বর্ত্তমানতা অনুভব এবং স্বীকার করেন। সাহসী ব্রাহ্ম বলেন, কেবল একটি অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে হইবে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মধ্যে সর্ব্বময় হরিকে দেখিতে হইবে, কেবল গঙ্গানদীর মধ্যে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে দেখিলে হইবে না; কিন্তু সমুদায় নদীর মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এইরূপে বীর ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বারা পৌত্তলিকতার ভয় দূর হইল। কারণ পৌত্তলিকতার অর্থ কি? ভূমা মহান্ বিরাট ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া কোন একটি পরিমিত স্থানে বদ্ধ করা, সর্ব্ব-ব্যাপী ঈশ্বরকে একটি পুতুল কিংবা একটি বৃক্ষে প্রতিষ্ঠিত মনে করাই পৌত্তলিকতা। কিন্তু হরিময় জগৎ ইহা স্বীকার করিলে আর পৌত্তলিকতার ভয় থাকে না। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন, "সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের সত্তায় পরিপূর্ণ, এমন কোন সৃষ্টবস্তু নাই যাহার মধ্যে স্রষ্টা বর্ত্তমান নহেন, যাহারা জগৎকে ঈশ্বরবিহীন মনে করে তাহারা নাস্তিক।" বাস্ত-বিক ঈশ্বরপূর্ণ জগৎকে নিরীশ্বর মনে করা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহাকে অন্ধকার শূন্য মধ্যে নিক্ষেপ করা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু সংকীর্ণকে বিস্তীর্ণ করা, সকল স্থান হইতে সত্য সংগ্রহ করা, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অধি-

ষ্ঠান স্বীকার করা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। কোন এক জন সাধুর পক্ষপাতী হইয়া অপর সাধুগণকে ভণ্ড অথবা প্রবঞ্চক মনে করা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে গ্রহণ করা, সমুদায় সাধু অবতারের মধ্যে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা ও রূপ গুণ দর্শন করা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৌত্তলিক-দিগের মতে কোন একটি বিশেষ বৃক্ষে, কোন একটী বিশেষ নদীর মধ্যে অথবা কোন এক জন সাধু অবতারের মধ্যে ঈশ্বর বদ্ধ। প্রকৃত ব্রাহ্ম দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, শুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম কোন এক স্থানে বদ্ধ নহেন, তিনি সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী। হে মুক্তিপ্রার্থী সাধকগন, আগে তোমরা ব্রহ্মকে পৌত্তলি-কতার বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তবে ত তোমরা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। আগে ব্রহ্মমুক্তি হউক, পরে জীবের মুক্তি। হে ভ্রান্ত জীব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, বিরাট্ ব্রহ্মকে কেন তুমি একটি ক্ষুদ্র বট অথবা অশ্বত্থ গাছের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে? যদি মুক্তি চাও, এই মিথ্যা ভ্রম দূর কর। মিথ্যা মুক্তি দিতে পারে না, সত্যই কেবল মুক্তি দান করিতে পারে। দিব্যজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে মুক্ত করিয়া সমু-দয় বিশ্বের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। চক্ষু খুলিয়া দেখ ব্রহ্মময় এই জগৎ, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম, তিনি কোন একটি বৃক্ষে কিংবা কোন একটি স্থানে বদ্ধ নহেন। স্বর্গ হইতে নববি-ধান অবতীর্ণ হইয়া পৌত্তলিকতার সকল বন্ধন ছেদন করিয়া জগতের নিকট ঈশ্বরকে বন্ধন মুক্ত করিয়া প্রকাশ

করিতেছেন। নববিধান বলিতেছেন;—"বেদ, পুরাণ, বাই-বেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতেছে।" হরি, ব্রহ্ম, যিহোভা প্রভৃতি সমুদায় নাম সেই এক ঈশ্বরকেই দেখাইয়া দিতেছে। নববিধানের ঈশ্বর বন্ধনমুক্ত হইলেন। নববিধান উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "ঈশ্বর সকল দেশের এবং সকল জাতির দেবতা; তিনি কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কিংবা কোন এক দেশে বদ্ধ নহেন।" পৌত্তলিকদিগের মতে হরি বদ্ধ; নববিধানবাদী ব্রাহ্মের মতে হরি মুক্ত। এক বৃক্ষে হরি, এক গ্রন্থে হরি, এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে হরি, ইহা পৌত্তলিকতা। সর্ব্বত্র হরি, ইহা নববিধান অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম। হে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি কি মনে কর তোমার হুকুমে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সমুদয় সাগর ছাড়িয়া কেবল গঙ্গাতে আসিয়া বাস করিবেন? তোমার উপদেশে কি অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার অনন্তব্যাপ্তি কাটিবেন? ঈশ্বর কদাচ তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। অতএব কেহই আর পৌত্তলিকতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইও না। হে ভীরু ভ্রান্ত ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, তুমি কি মনে কর তোমার পৌত্তলিকতার ভয়ে মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার জগৎ সংসার ছাড়িয়া অন্ধকার মধ্যে গিয়া বাস করিবেন? তোমার ভয়ে কি মনুষ্যসমাজ নিরীশ্বর হইবে? ধিক্ তোমার ভয়ে, ধিক্ তোমার মতে, তুমি বিরাট্ ঈশ্বরকে কাটিয়া খর্ব্ব করিতে চাও?

গাহ্য অক্ষয় ও অপার এবং তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয়েন না।

এই মাত্র আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের যে কথা শ্রবণ করিলাম ইহা সত্য। যোগী ব্যক্তি সত্য সত্যই সমুদ্রের ন্যায় অক্ষয়, অপার, ও দুরবগাহ। কিন্তু এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্যে প্রভেদ রহিল কোথায়? যোগী কিরূপে যোগেশ্বরের তুল্য হইবে? উপাসক কিরূপে উপাস্য দেবতার গুণবিশিষ্ট হইবে? পরিমিত মানুষ কিরূপে অনন্ত দেবতার স্বভাব লাভ করিবে? যোগী যোগসাধন বলে যতই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হউন না, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, ভাব, ধর্ম্ম সকলই ক্ষুদ্র ও পরিমিত। তাঁহার মনের সমুদয় ভাব অন্তবিশিষ্ট। মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণ, মন, হৃদয়, আত্মা সকলই সীমাবদ্ধ, মানুষের কিছুই অসীম অথবা পূর্ণ নহে। তবে কেন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যোগী ব্যক্তি অক্ষয় অপার ও দুরবগাহ। অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে। বাস্তবিক মানুষ যোগী হইলে অক্ষয় ও অপার হয়। জীবাত্মা যখন যোগ প্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন আর তাহার অন্ত জ্ঞান থাকে না, তাহার ক্ষুদ্রতা বোধ থাকে না। তখন সে অনন্তের সঙ্গে একাত্মা হইয়া আপনাকে আপনি অনন্ত মনে করে, তাহার আর স্বতন্ত্রতা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি থাকে না। এই অসীমতা জীবের নহে, ইহা পরমাত্মার। জীব যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া

পরমাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে এ অসীমতা বুঝিতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র নদী যত ক্ষণ আপনার দুই দিকে তট দেখিতে দেখিতে চলিতেছিল, তত ক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ জানিতেছিল; কিন্তু যখন অকূল সাগরে ঝাঁপ দিল, তখন অনন্ত সাগরে মগ্ন হইয়া আর আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে পারিল না; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা যত ক্ষণ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, তত ক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়; কিন্তু যখনই সে অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়া যায় তখন আর আপনার ক্ষুদ্রত্ব দেখিতে পায় না। ক্ষুদ্র নদীর জল অসীম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে অনন্ত ও অকূল মনে করে; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে ভূমা মহান্ বিরাট্ ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ব্রহ্মময় জ্ঞান করে, আপনার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল শক্তিতে সেই অনন্ত ব্রহ্মকে দেখিতে পায়। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, যে অবস্থায় সে আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মের অংশ অথবা সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করে। হে মনুষ্য, যত ক্ষণ তুমি তোমার মধ্যে বদ্ধ থাক তত ক্ষণ তোমার শক্তি, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি সকলই অল্প এবং অন্তবিশিষ্ট; কিন্তু যখন তুমি স্বার্থ এবং মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ ঈশ্বরেতে নিমগ্ন হও তখন অনন্ত জীবন, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অপার প্রেম এবং অসীম পুণ্য শান্তিতে লীন হইয়া যাও। অনন্তের সঙ্গে যখন ক্ষুদ্রের

সাবধান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র, পরিমিত, বদ্ধ মনে করিও না, এবং তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না। ভূমা মহান্ ঈশ্বর কেবল ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, এবং অপর কোটি কোটি মনুষ্যের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না এরূপ মনে করিও না। সত্য ধর্ম্ম, মুক্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম সাহসের ধর্ম্ম, প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে হরিলীলা প্রদর্শন করেন। হরিময় এই জগৎ, তোমার আমার তাঁহার সকলের জীবনে হরি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রাণস্বরূপ হরি বিনা কি কেহ বাঁচিতে পারে? বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখি, যিনি আমার হরি তিনিই তোমার হরি। তোমার হরি আমার ভিতরে, আমার হরি তোমার ভিতরে। আহার করিতে যাই দেখি অন্নের মধ্যে হরি। জল পান করি, দেখি জলের ঘটীর ভিতরে হরি আপনার পবিত্র আবির্ভাব দ্বারা জলকে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই হরি। যে কোন বস্তু অথবা জীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহারই মধ্যে হরিকে দেখিতে পাই। তুমি আমার বাড়ীতে বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল, গো, অশ্ব প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলে, আমিও তোমার বাড়ীতে অন্ন, বস্ত্র, পশু, পক্ষী প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলাম। কোথায় পৌত্তলিকতা? নববিধানের নিশান যে দিন উড়িয়াছে, সে দিন পৌত্তলিক-

তার ভয় চলিয়া গিয়াছে। এক সাধুর বক্ষের ভিতরে ছিলেন যে হরি, নববিধানের আবির্ভাবে সকল সাধুর বক্ষের ভিতরে সেই হরি প্রকাশিত। এক গঙ্গা অথবা এক জর্দ্দান নদীতে ছিলেন যে ঈশ্বর, নববিধানের প্রভাবে আজ সেই ঈশ্বরকে সকল নদীতে এবং সমস্ত জলে দেখিতেছি। কি সুখের নববিধান!! আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা দেখিতেছি জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল। ভক্তের চক্ষুরূপ দুই দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই দুই দ্বার দিয়া দশদিক্ হইতে হরি আসিয়া ভক্তের হৃদয়গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য হরিলীলা!! ভক্তের অন্তর বাহির এবং দশ দিক্ হইতে হরিজ্যোতি বাহির হইতেছে। কি ভয়ানক হরির তেজ!! ফাটিল ব্রহ্মাণ্ড ঘর, এবং বিরাট মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হরি বাহির হইলেন, পৌত্তলিকতার মৃত্যু হইল, পবিত্র নববিধান, সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম মহীয়ান্ হইল।

যোগী অক্ষয় এবং অপার।

রবিবার, ৩ রা শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

"মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ। অনন্তপারো-হ্যক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ॥" শ্রীমদ্ভাবত ১১।৮।৫।

অস্যার্থঃ। যোগী প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির গম্ভীর দুরব-

যোগ হয় তখন আর ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতা থাকে না। বস্তুতঃ মনুষ্যসন্তান অনন্ত ঈশ্বরের অংশ, এবং অনন্তকাল সেই অনন্তস্বরূপে আরাম ও সুখ শান্তি সম্ভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট। যত দিন সে তাহার সেই অনন্তস্বরূপ পিতাকে ভুলিয়া থাকে, তত দিন সে ক্ষুদ্র নীচ জীবন ধারণ করে; কিন্তু যখনই তাহার মন জাগ্রৎ হয়, এবং অনন্ত ঈশ্বর যে তাহার পিতা ইহা তাহার স্মরণ হয়, তখন সে সন্তপ্ত চিত্তে ও কাতর স্বরে বলে;—"পিতা গো এক বার হের গো আমায়. আর সহে না প্রাণে। তোমারি সন্তান হয়ে, রয়েছি কাঙ্গা-লের প্রায়।" তখন সে তাহার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নীচ আমিত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিতার অসীম মহিমা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যসাগরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করে এবং মহাযোগবলে সেই অনন্ত সাগরে আপনার নিকৃষ্ট আমিত্ব বিলুপ্ত করিতে বাসনা করে। এই পিতাপুত্ররহস্য অতিনিগূঢ় এবং আনন্দজনক। ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন. কিন্তু পুত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর একাকী ছিলেন? পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর পিতৃত্ব-বিহীন ছিলেন? অর্থাৎ পুত্র বিনা যখন কেহই পিতা হইতে পারে না, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর পিতা ছিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর কখনই পুত্র-বিহীন ছিলেন না। ঈশ্বর নিত্য পিতা, তিনি অনন্ত কাল পিতা, ঈশ্বরেতে এমন কোন সম্পর্ক নাই যাহার আদি অন্ত

আছে। এই ভাবে তাঁহার পুত্রও অনন্ত ও অক্ষয়। কেন না তাঁহার পুত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ভাবে তাঁহার বক্ষের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন ইহা সত্য, কিন্তু তিনি কোথা হইতে এবং কিরূপে সৃষ্ট হইলেন? অকস্মাৎ শূন্য হইতে কি ঈশ্বরের পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন? সন্তানের কোন উপকরণ ছিল না, অথচ হঠাৎ কি সন্তান জন্মিল? অথবা ঈশ্বর কি মৃত্তিকা, প্রস্তর, অথবা অন্য কোন ভৌতিক পদার্থ লইয়া তাঁহার সন্তান গঠন করিলেন? না। শূন্য হইতে সন্তান জন্মে নাই এবং কোন সৃষ্ট জড় কিংবা চেতনবস্তুর সমষ্টি দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার সন্তানকে গঠন করেন নাই। তাঁহার সন্তানের ভাব উপকরণ তাঁহার প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। অপ্রকাশ সন্তান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছিল, অব্যক্ত পুত্র অনাদি অনন্ত পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং পিতা হইতে পিতার মূর্ত্তি লইয়া শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, পিতার এই পাঁচটী স্বরূপ লইয়া পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। পিতার বক্ষে পুত্র অব্যক্ত ভাবে ছিল। পিতা ডাকিলেন;—"সন্তান আয়," সন্তান আসিল। পিতার ইচ্ছাতে অপ্রকাশিত সন্তান প্রকাশ হইল। গর্ভস্থ সন্তান যেরূপ আভ্যন্তরিক নাড়ীদ্বারা জননীর শোণিত গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে, অব্যক্ত সন্তানও সেইরূপ ঈশ্বরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ঈশ্বরের জীবনে জীবিত

ছিল ; কিন্তু যখন সন্তান পৃথিবীতে প্রকাশিত হইল তখন কি সে পিতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীন হইল? ঘটিকা-যন্ত্র যেমন ঘটিকাযন্ত্রনির্ম্মাতার শক্তি ও সাহায্য ভিন্ন আপনা আপনি চলিতে পারে, ঈশ্বর সন্তানও কি সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি ও সাহায্য ভিন্ন পৃথিবীতে স্বতন্ত্রভাবে আপনা আপনি কার্য্য করিতে পারে? ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানের সঙ্গে কি ঘটিকাযন্ত্রনির্ম্মাতা ও ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় সম্পর্ক? না। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তানের এরূপ সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানের জীবনের জীবন এবং তিনি তাঁহার সন্তা-নের সকল শক্তির মূল শক্তি। তাঁহার সন্তান তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না, একটী চিন্তা করিতে পারে না, একটি কার্য্য করিতে পারে না। পিতাকে দূরে রাখ পুত্রের আর অস্তিত্ব থাকে না। পৃথিবীর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ় এবং অখণ্ড প্রাণযোগে সংযুক্ত। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি ; সেইরূপ ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তান। যেমন সূর্য্যাস্ত হইলে আর সূর্য্যের কিরণ থাকে না, সেইরূপ পিতার শক্তির তিরোভাব হইলে আর পুত্রের আবির্ভাব থাকে না। পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে এক পদ চলেন? পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে একটী সচ্চিন্তা পোষণ করেন, কিংবা একটি সৎকার্য্য করেন? যাঁহারা জ্যোতির তত্ত্ব শিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন জ্যোতির মূল বস্ত

করিলে বাহিরে সমস্ত জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; সূর্য্য অস্তমিত হইলে অমনি পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তেমনি পিতা তাঁহার শক্তি প্রত্যাহার করিলে পুত্রের আর কোন ক্ষমতা থাকে না। যত ক্ষণ আকাশে সূর্য্য উদিত থাকে, তত ক্ষণ কোটি কোটি ক্রোশ আলোকে উজ্জ্বলিত; কিন্তু যখনই সূর্য্যের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়, তখন আর বিন্দু-মাত্র আলোক থাকে না। সেইরূপ যত ক্ষণ পিতা পুত্রের মধ্যে বর্ত্তমান, তত ক্ষণ পুত্রের মহাগৌরব এবং উৎসাহ; কিন্তু পিতা হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন কর, পুত্র নিতান্ত অপ-দার্থ এবং মৃতপ্রায়। বাস্তবিক পুত্র বিনা পিতা থাকিতে পারেন না এবং পিতা বিনা পুত্র থাকিতে পারে না। ঈশ্বর এক, পিতৃত্ব এক। পুত্রত্বও এক। ঈশ্বরের এক আদর্শ পুত্র হইতে বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করিতেছে। রক্ত মাংসের পুত্র ঈশ্বরের পুত্র নহে। ঈশ্বরের পুত্রত্ব কোন বিশেষ জাতির উপরে নির্ভর করে না। তাঁহার এক পুত্র, তাঁহার এক আদর্শ পুত্র। তাঁহার গৃহে হিন্দু পুত্র নাই, বৌদ্ধ পুত্র নাই, ইংরাজ কিংবা খৃষ্টান পুত্র নাই। তাঁহার পুত্র আত্ম-স্বরূপ এবং তাঁহার অনুরূপ। ঈশ্বর নিজে যেমন হিন্দু, খৃষ্টান মুসলমান কিছুই নহেন, সকল প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ ও উপাধিবিবর্জ্জিত, তাঁহার আত্মিক সন্তানও সেইরূপ সকল প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ ও উপাধিবিবর্জ্জিত। তাঁহার পুত্রের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, কিংবা ধর্ম্মভেদ নাই। সূর্য্য

হইতে যেমন সহস্র সহস্র রশ্মি নির্গত হইয়া সহস্র দিক আলোকিত করে; কিন্তু সমুদয় রশ্মিই এক পদার্থ; সেই-রূপ ঈশ্বরের এক পুত্রভাব হইতে কোটি কোটি পুত্র জন্ম ধারণ করিয়া জগতের অজ্ঞান ও পাপ দুঃখের অন্ধকার দূর করিতেছে। যেমন প্রকাণ্ড জ্বলন্ত অগ্নি হইতে চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল ধাবিত হয়, সেইরূপ এক অনন্ত ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কিংবা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার ছোট ছোট সন্তানেরা জগতের হিতসাধন করিতেছে। সকলেই তাঁহার এক পুত্রভাব প্রকাশ করিতেছে। যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত সৌর-জগৎকে আলোকিত করে; কিন্তু কিরণ কোটি কোটি যোজন দূরে গিয়াও বলিতে পারে না যে, "এখন আমি সূর্য্য হইতে বহু দূরে আসিয়াছি, এখন সূর্য্য না থাকিলেও আমি আমার কার্য্য করিতে পারি।" সেইরূপ ঈশ্বরের সন্তান স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াও ঈশ্বরবিহীন হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুই করিতে পারে না। সন্তানের চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, সকলই তাহার পিতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরেরই। যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের সন্তান অথবা সেই সন্তানের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম পুণ্য ও শান্তি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে। সন্তানের সমস্ত সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য তাঁহার সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য। সন্তানের নিজের কিছুই নাই। যেমন সূর্য্য বলিতে পারে না আমার

কিরণ আমার নহে, তেমনি ঈশ্বর বলিতে পারেন না আমার সন্তান আমার নহে। সূর্য্য যেমন কিরণ বিনা থাকিতে পারে না তেমনি পিতা পুত্র ছাড়া থাকিতে পারেন না। জগতে যত গুলি সূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ হয় সমুদয় সূর্য্যের মধ্যে থাকে, সেইরূপ জগতে যতগুলি ঈশ্বরসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলে অব্যক্ত সন্তানরূপে ঈশ্বরেরর বক্ষে নিদ্রিত থাকেন। শরীর পৃথিবীর প্রণালী অনুসারে ভৌতিক নিয়মে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান ভৌতিক নিয়মানুসারে জন্ম গ্রহণ করেন না। এই জন্য খ্রীষ্ট শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে মেরীতনয় মহর্ষি ঈশা পবিত্রাত্মার সন্তান। ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের পুণ্য এবং ঈশ্বরের শান্তি লইয়া সেই নরোত্তম ব্রহ্মকুমার পৃথি-বীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমার মধ্যে, সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে সেই কুমারেরর ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বরের সন্তানকে বিশেষ অর্থে কুমার বলা যাইতে পারে। কুমার বলিলেই রাজার মহিমা স্মরণ হয়। রাজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, রাজভাব নাই, অথচ কুমার ইহা হইতে পারে না। রাজকুমার রাজার গৌরব এবং রাজশ্রী ও রাজপ্রতাপের অধিকারী। প্রত্যেক নর নারী ব্রহ্মকুমার এবং ব্রহ্মকুমারী; অর্থাৎ প্রতি জন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী এবং অধিকারিণী। ঈশ্বর সন্তান ঈশ্বরের সমুদয় প্রকৃতি ও শক্তির অধিকারী। ব্রহ্মতনয় ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া কিছুই করিতে পারে না। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্র বাঁচিতে পারে না। জগৎকর্ত্তাকে ছাড়িয়া জগৎ এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্যশিশু যত দিন স্তন পান করে তত দিন মাতার উপরে নির্ভর করে, যত দিন অক্ষম থাকে, তত দিন পিতার উপর নির্ভর করে, যখন বালক বর্দ্ধিত ও বয়োপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তখন আর সে পিতা মাতার উপর নির্ভর করে না। এ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মতনয়ে খাটিবে না। ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মতনয়ের সেরূপ সম্পর্ক নহে। মনুষ্যশিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতা মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মতনয় কখনও ব্রহ্মকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না। যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্যের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সেইরূপ ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মের সঙ্গে গূঢ় প্রাণযোগে চিরসম্বদ্ধ। যেমন সূর্য্য নাই অথচ সূর্য্যের জ্যোতি আছে, ইহা ভাবা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম নাই অথচ ব্রহ্মতনয় আছে, ইহা ভাবা যায় না। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মতনয় সংযুক্ত। ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মতনয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবা যায় না। যোগেতে এই অভিন্নতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। যোগে পিতা পুত্রের ভেদ থাকে না, সেই এক অনন্ত ব্রহ্ম পুত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। তখন জলেতে জল, জ্যোতিতে জ্যোতি। যেমন ক্ষুদ্র নদী সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে সেই নদীর আর ক্ষুদ্রতা ও স্বতন্ত্রতা থাকে না, সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা অসীম সমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলে তাহার আর ক্ষুদ্রতা

ও স্বতন্ত্রতা বোধ থাকে না। তখন সেই যোগী ব্যক্তি অক্ষয়, অপার ও দুরবগাহ্য। যোগী তখন আপনার জীবন-স্বরূপ ক্ষুদ্র গঙ্গার শাদা জল দেখিতে পায় না, কিন্তু উর্দ্ধে নিম্নে, অন্তরে বাহিরে ও চারিদিকে অনন্তজীবনস্বরূপ ব্রহ্মসমুদ্রের গাঢ় সুনীল জল দেখিতে পায়। যোগবিহীন অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে, যোগে সমস্ত একাকার। অতল-স্পর্শ ব্রহ্মসমুদ্রে মগ্ন হইয়া যোগীর মন অক্ষয়, অপার ও দুরবগাহ্য হয়। হে মনুষ্য, তোমার দেহ ব্রহ্মতনয় নহে। ব্রহ্মতনয় তোমার দেহের মধ্যে আছেন সত্য; কিন্তু ব্রহ্মতনয় তোমার দেহের বাহিরেও আছেন। কেন না ব্রহ্মতনয় জড়দেহে বদ্ধ নহেন। দেহ ব্রহ্ম-তনয়ের বাড়ী নহে; কলিকাতা, ভারতবর্ষ, এসিয়া, কিংবা ইউরোপ অথবা সমস্ত পৃথিবীও ব্রহ্মতনয়ের পূর্ণ বাস-গৃহ নহে, ব্রহ্মতনয় এ সকল দেশে আছেন অথচ এ সকল দেশের অতীত। এই শতাব্দী কিংবা অন্য শতাব্দী ব্রহ্ম-তনয়ের সমগ্র জীবন নহে। ব্রহ্মতনয় কালাতীত। প্রকৃত ব্রহ্মতনয় কোন দেশে কিংবা কোন কালে বদ্ধ নহেন; ব্রহ্মতনয় অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার বাসগৃহ। যে ব্রহ্মতনয় বিহঙ্গের ন্যায় এই শরীর পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনন্তচিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিচরণ করেন, সেই যোগী আত্মাই যথার্থ আমি। হে ব্রাহ্ম, এই ব্রহ্মতনয় তত্ত্ব অতি অদ্ভুত তত্ত্ব, অতি মধুর

তত্ত্ব! এই তত্ত্ব সাধন কর, এই তত্ত্বরস আস্বাদন কর, অপার ও বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিবে।

ধর্ম্ম স্বাভাবিক।

রবিবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যেরূপ সাধন কর না কেন তুমি কদাচ স্বভাবের বিরোধী হইও না। স্বভাব ঈশ্বরের ভাব, অতএব স্বভাবকে অবহেলা করিও না। ভক্তির সহিত স্বভাবের দেবত্বকে পূজা কর। ব্রহ্মপ্রকৃতিকে পূজা কর। স্বভাবের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দেও। কেন না স্বভাব ও ব্রহ্মেতে প্রভেদ নাই। প্রকৃতিদেবী ঈশ্বরের শক্তি। স্বভাব শব্দের অর্থ আত্মার ভাব। স্ব শব্দের অর্থ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা; সুতরাং স্বভাব অর্থ ব্রহ্মের ভাব, ঈশ্বরের ভাব। বাস্তবিক স্বভাব দেবভাব। যিনি স্বভাবের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইলেন, তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইলেন। যিনি স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত তিনি ঈশ্বরকে কাটিতে উদ্যত। যিনি স্বভাবের বন্ধু তিনি ঈশ্বরে বন্ধু, যিনি স্বভাবের শত্রু তিনি ঈশ্বরের শত্রু; যাহা অস্বাভাবিক তাহা ঈশ্বরের বিরুদ্ধ, যাহা স্বাভাবিক তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং অনুমোদিত। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত, সে ঈশ্বরের ধর্ম্মপথে চলিতেছে;

আর যে অস্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট। স্বভাবই ধর্ম্ম, স্বভাবলঙ্ঘন অধর্ম্ম। আত্মার স্বভাব, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, স্বর্গ, মুক্তি, একই পদার্থ। পক্ষান্তরে স্বভাব হইতে বিচ্যুতি, অথবা আত্মার বিকার, পাপ, নরক একই কথা। অতএব হে প্রকৃত ধর্ম্মার্থী, তুমি স্বাভাবিক ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হও। নব-বিধান স্বভাবের ধর্ম্ম। প্রকৃত নব-বিধানবাদী স্বভাব মন্ত্রে দীক্ষিত, স্বভাবের অন্যথাচরণ করা তিনি পাপ মনে করেন। কুটিল, অস্বাভাবিক পথকে নব-বিধানবাদী ঘৃণা করেন, তিনি সহজে স্বভাবতঃ তাঁহার সরল হৃদয়ে হরিপাদপদ্ম ধারণ করেন। যদি প্রকৃত ঈশ্বরকে চাও তবে স্বভাবকে অবজ্ঞা করিও না। স্বাভাবিক না হইলে, সহজ মানুষ না হইলে কেহই ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারে না। অস্বাভাবিক, বিকৃত লোকেরা ঈশ্বর হইতে বহু দূরে। স্বভাব আমাদিগের গুরু। সরলস্বভাব ধ্রুব নারদ প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ ভক্তগণের নিকট দীক্ষিত হন। হে ঈশ্বরার্থী, তুমি স্বভাবের পথে চলিলে ঈশ্বরকে পাইবে। যদি তুমি স্বভাবের সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার আপনার বিকৃত কল্পনা অনুসারে কোনপ্রকার অস্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন কর, তাহা হইলে তুমি প্রকৃত ঈশ্বরকে পাইবে না। উপাসনার সময় তোমার মুখভঙ্গীতে কিংবা হস্ত, পদ, মস্তকাদি চালনাতে যদি কিছু অস্বাভাবিক থাকে, অথবা তোমার কণ্ঠের স্বর যদি কিঞ্চিৎমাত্রও বিকৃত হয়, তাহা

হইলে স্বভাবের ধর্ম্ম নব-বিধান বলিবেন, "এ ব্যক্তি আমার ছাত্র নহে।" যদি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরের সাধক হইতে চাও তবে স্বভাববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অস্বাভাবিক সমস্ত পরিত্যাগ করিলে তবে প্রকৃতরূপে ধর্ম্ম-সাধন আরম্ভ করিতে উপযুক্ত হইবে। অতএব হে সাধনার্থী, সাধনের পূর্ব্বে তোমার শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। সর্ব্ব প্রথমে শরীরকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধনে নিযুক্ত করিবে না, সাধনের সময় যে ভাবে শরীরকে রাখিলে স্বভাব সন্তুষ্ট হয় সেই ভাবে শরীরকে রাখিবে। যদি কোন ভাবে বসিলে শরীরের কষ্ট হয়, সে ভাবে বসিবে না। চক্ষু নাসিকা প্রভৃতিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক, উৎকট অবস্থায় অবস্থিত হইতে দিবে না। যে ভাবে মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি রাখিলে মন নিরুদ্বেগ ও শান্ত থাকে, সেই ভাবে শরীরের অঙ্গ সকল রাখিবে। সর্ব্বোতোভাবে স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবে। অস্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি, প্রকৃতি সহজে ঈশ্বরের ইচ্ছা, রুচি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন, অতএব প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করেন, তদনুসারে চলিলেই আমরা প্রকৃত ঈশ্বরকে লাভ করিব এবং আমাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতিমূলক সত্য ধর্ম্ম হইবে। যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ঈশ্বরের

শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার কল্পিত ধর্ম্মসাধন করি, তাহা হইলে আমাদিগের বিকৃতি ও মৃত্যু হইবে। স্বভাবের বিরোধই বিকার। জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল কার্য্যে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা স্বভাবের অধীন অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন রহিয়াছি তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্ফূর্ত্তি ও শান্তি থাকে। আর যখনই আমরা স্বভাবভ্রষ্ট হই, যখনই স্বেচ্ছাচারী হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ধর্ম্মব্রতপালনে উদ্যত হই, তখন কিছুতেই আমাদিগের মনে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ থাকে না।

ঈশ্বর দর্শন যে এত বড় ব্যাপার ইহা যদি স্বাভাবিক হয় তবেই সাধকের কল্যাণ হয়, ইহা যদি অস্বাভাবিক হয় তবে সাধকের জীবনে অনেক বিপদের আশঙ্কা। ব্রহ্মদর্শনের সময়, ধ্যানের সময় কত লোক মুখকে বিকটাকার করে, চক্ষুকে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া লয় এবং নানা প্রকার ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গী করে, এবং কেহ কেহ নিঃশ্বাস বন্ধ করে, কিন্তু এ সকল অস্বাভাবিক উপায়ে কদাচ ব্রহ্মদর্শন হয় না। যেমন সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে শরীরের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেইরূপ সহজে ও স্বভাবতঃ যদি জীবাত্মা পরমাত্মাকে দেখিতে পায়, সেই দর্শনই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন। চক্ষু যেমন সহজে সৃষ্টি ও সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, শ্রোত্র যেমন সহজে বাহিরের শব্দ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে,

হস্ত যেমন সহজে বাহিরের বস্তু সকল স্পর্শ করে, সেই-রূপ অন্তরের বিশ্বাসচক্ষু যখন সহজে ব্রহ্মদর্শন করে, অন্ত-রের বিবেককর্ণ যখন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে, এবং হৃদ-য়ের ভক্তি হস্ত যখন সহজে ব্রহ্ম পাদপদ্ম স্পর্শ করে, সেই সহজ অবস্থায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই যথার্থ ও অকৃত্রিম। তখন স্বভাব আপনি বলিয়া দেয় "হাঁ, ঠিক ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্ম-শ্রবণ, ও ব্রহ্মস্পর্শ হইয়াছে।" নতুবা নানাপ্রকার কষ্টে মস্তিষ্ক আলোড়ন এবং চিত্তবিলোড়ন করিয়া যে ব্রহ্মদর্শন করিবার চেষ্টা তাহা অস্বাভাবিক এবং বিফল। সে কাল্পনিক ব্রহ্ম-দর্শন হইতে অমৃত উৎপন্ন না হইয়া বরং বিষ এবং মৃত্যু উৎপন্ন হয়। সেই কাল্পনিক ব্রহ্মদর্শন শত্রুর প্রদত্ত বিষাক্ত ফল। অস্বাভাবিক কিছুই ভাল নহে। যাহারা অস্বাভাবিক-রূপে যোগ,ধ্যান অথবা ব্রহ্মদর্শন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আত্ম-প্রবঞ্চিত হয়। কোন কোন ভ্রান্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা চক্ষু মুদ্রিত ও নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ব্রহ্মকে এক প্রকার জ্যোতিঃস্বরূপ কল্পনা করে এবং নানাপ্রকার চমৎ-কার জ্যোতি দর্শনের গল্প করিয়া জগৎকে আশ্চর্য্য করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে সমস্ত দর্শন অসত্যমূলক, সুতরাং তদ্দ্বারা মুক্তি ও অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশা নাই। যথার্থ ব্রহ্মদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন চক্ষু খুলিলেই সম্মু-খস্থ গোলাপ কিংবা পদ্ম দেখিতে পাই, তেমনই অন্তরের চক্ষু খুলিয়া সহজে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে দেখিয়া বলি, "ব্রহ্ম

তুমি আছ,” তখনই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয়। যুক্তি, তর্ক ও বিচার করিয়া অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করা প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন নহে। যখন ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন তাহা অতি সহজে হয়, এক নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয়। নতুবা এক বৎসর কিংবা এক শতাব্দীতেও ব্রহ্মদর্শন হয় না, কেন না ব্রহ্ম কেবল স্বাভাবিক সরল সাধকের নিকটেই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। কুটিল অস্বাভাবিক লোক বহুকাল সহস্র প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বর সরলতার বন্ধু। মহাপাপীও যদি সরল অন্তরে তাঁহাকে ডাকে ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দেন, আর ধর্ম্মাড়ম্বর-প্রিয় কুটিল ব্যক্তি যদি লক্ষ বার তাঁহাকে ডাকে, তথাপি সে তাঁহার দেখা পায় না।

যেমন ঈশ্বরদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ করাও সহজ এবং স্বাভাবিক। যখন হইবার তখন এক মিনিটের মধ্যে হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়; আর যাহার সহজে শুদ্ধ হইবার ইচ্ছা না হয়, সে বহুকাল নানা প্রকার কঠোর সাধন করিলেও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যদি তেমন ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বল হয়, এক পলকের মধ্যে রিপু জয় করিতে পারিবে, আর যদি তেমন ইচ্ছা ও সংকল্প না হয়, তবে যুক্তি ও বাহ্যিক সাধন দ্বারা দশ বৎসরেও ইন্দ্রিয়দমন করিতে পারিবে না। এক বার যদি দুর্জ্জয় ব্রহ্ম-বলে বলী হইয়া জোরের সহিত বলিতে পার, “আর মনের

মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থ-পরতা প্রভৃতি কিছুই পোষণ করিব না," তখনই এ সকল দুরন্ত রিপু তোমার হৃদয় হইতে পলায়ন করিবে। তখন দেখিবে আর তোমার মনে আসক্তি নাই, রাগ নাই, হিংসা নাই এবং শরীরে অন্য কোন প্রকার রিপুর উত্তেজনা ও জ্বালা নাই। এইরূপে যদি পার এক মিনিটে মনঃসংযম এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে পারিবে, নতুবা চল্লিশ বৎসরেও পারিবে না। যেমন ইচ্ছা হইলেই পলকের মধ্যে দাঁড়াইতে পার, কিংবা উপর দিকে হাত তুলিতে পার, তেমনই ইচ্ছা হই-লেই বিপথ হইতে সুপথে পাপ হইতে পুণ্যের দিকে মনকে ফিরাইতে পার। যেমন শরীরসঞ্চালন সহজ ও স্বাভাবিক, তেমনি মন পরিবর্ত্তন সহজ ও স্বাভাবিক। ঐ তোমার সমক্ষে পুষ্পপল্লবে সজ্জিত একটি সুন্দর বৃক্ষ রহিয়াছে; যদি তুমি ইচ্ছা কর পলকের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবে, তাহা দেখিবার জন্য চক্ষু ঘর্ষণ কিংবা অন্য কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। সহজে শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইবে। এই মন্দিরের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কি কেহ বলিতে পারেন বস্তুদর্শন বহু আয়াসসাধ্য এবং কালসাপেক্ষ। সকলেই একবাক্যে বলিবেন বস্তুদর্শন অতি সহজ, অনায়াসসিদ্ধ এবং কিছুমাত্র সময়সাপেক্ষ নহে। হে নির্ব্বোধ মন, যদি বাহিরের ও দূরের বস্তু অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যায়,

তবে যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, যিনি তোমার অন্তরতম, ন্টতম, তাঁহাকে দর্শন করিতে কি তোমার অধিক সময় লাগবে? ব্রহ্মদর্শন সময়ের অতীত। নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয়। যদি একবার সরলভাবে হরিকে ডাকিতে পারে, তবে নিমেষে পাতকী স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। "হে ব্রহ্মপদার্থ, তুমি অত্যন্ত নিকটে আছ, অথচ আমাদিগের বিকৃত মন তোমাকে দেখিতে পাইতেছে না। চক্ষের সম্মুখে তুমি রহিয়াছ, অথচ আমরা চক্ষু রগড়াইতেছি। নির্ম্মল স্বচ্ছ স্বভাবকে আমরা বিকৃত ও মলিন করিয়াছি, তাই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা।" মনের সহজ অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন সহজ, আর বিকৃত অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। যেমন ব্রহ্মদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক তেমনই ব্রহ্মবাণীশ্রবণ এবং ব্রহ্মস্পর্শও সহজ এবং স্বাভাবিক। যেমন শরীরের কাণ পাতিয়া থাকিলেই বাহিরের শব্দ শুনিতে পাই, সেইরূপ ভিতরের বিবেককাণ পাতিয়া রাখিলে অতি সহজে আমরা ব্রহ্মবাণী শুনিতে পাই; আর যদি পাপের কুমন্ত্রণা ও কোলাহল শুনিতে শুনিতে বধির হই, কিংবা বিবেককর্ণকে বন্ধ রাখি, তবে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মবাণীশ্রবণ হইবে না। নির্ম্মল বিবেক যেমন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে, ভক্তিহস্ত তেমনি সহজে ব্রহ্মপাদ স্পর্শ করে। অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, ব্রহ্মস্পর্শ, সকলই অসম্ভব। মন স্বাভাবিক থাকিলে এক পলকের মধ্যে ব্রহ্ম-

দর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রহ্মস্পর্শ হয়, আর মন বিকৃত থাকিলে চল্লিশ বৎসরেও দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ কিছুই হয় না। বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা এক শুভ মুহূর্ত্তের মূল্য অধিক। পৃথিবীর চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা স্বর্গের এক মিনিট অধিক মূল্যবান্, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অনেকেই এই কথা জানেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে এক খানি দীর্ঘ চিঠী লেখা যাইতে পারে; কিন্তু সংক্ষেপে এক খানি ভাল পত্র লিখিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। অল্পসময়ে বাহুল্য লেখা হয়; কিন্তু ভাল লেখাতে অধিক সময় লাগে। খুব বুদ্ধি চালনা এবং বিচার করিয়া লিখিতে হইলে অধিক সময়ের আবশ্যক; কিন্তু হৃদয়ের ভাবে চালিত হইয়া লিখিলে অল্প সময়ের মধ্যে ও সহজে ভাল লেখা যায়। সেইরূপ যাহারা বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিতে চায়, তাহাদিগের অনেক সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু যাহারা সরলহৃদয়, তাহারা অনায়াসে পলকের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রহ্মস্পর্শ করে। পৃথিবীর বুদ্ধির লক্ষ বৎসর অপেক্ষা স্বর্গের সরলতার এক পলকের মূল্য অধিক। পৃথিবীর ঘড়ী, কলিযুগের ঘড়ী নরকের সময় রাখিতেছে। এ সকল ঘড়ী স্বর্গের শুভ মুহূর্ত্ত প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি শাক্য ও ঈশাকে জিজ্ঞাসা কর পাপ জয় করিতে কত সময় লাগে। তাঁহারা বলিবেন এক মিনিট। দুর্জ্জয় তেজের সহিত ঈশা বলিলেন, "দূর হও সয়তান্,"

আর এক মিনিটের মধ্যে চির কালের জন্য সয়তান ঈশাকে পরিত্যাগ করিল। সেইরূপ তেজস্বী শাক্য দৈব প্রতাপের সহিত বলিলেন, "দূর হও লোভ," আর মার তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য শাক্যকে পরিত্যাগ করিল। প্রত্যেক সাধু বলিবেন, হয় সহজে ও এক মিনিটে রিপু দমন করিবে, নতুবা ত্রিশ হাজার বৎসরেও রিপুজয় করিতে পারিবে না। অস্বাভাবিক উপায়ে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মদর্শন কি মনঃসংযম কিছুই হয় না। স্বভাব লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া যদি তুমি আপনি আপনার পরিত্রাণের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার যত্ন বিফল হইবে। ঈশ্বরাধীন, স্বভাবাধীন হইয়া যদি সাধন কর, তবে এক শুভ মুহূর্ত্তে, এক শুভ লগ্নে তুমি সিদ্ধ হইবে, আর যদি স্বভাবের বিরুদ্ধে তুমি চল্লিশ বৎসর সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাক, উপবাস কর, জাগরণ কর, কিংবা কণ্টকশয্যায় শয়ন কর, অথবা গ্রীষ্মকালে অগ্নিমধ্যে এবং শীতকালে জলের মধ্যে বাস কর, কিংবা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাক, তথাপি প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবে না। সহজ স্বাভাবিক সাধনে পলকের মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিবে, আর অস্বাভাবিক সাধনে শতবর্ষেও কিছু হইবে না। বিধাতা কি বিলম্বে কার্য্য করেন? না। তিনি একেবারে পলকের মধ্যে মহাব্যাপার সকল সম্পন্ন করেন। তাঁহার বিধি পলকের বিধি। যিনি কালাতীত, তাঁহার

সময়ের প্রয়োজন কি? তিনি নিত্য, তিনি যাহা করেন, একেবারে করেন। যেমন পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটে, তেমনি পলকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বময় তাঁহার দয়া ও শক্তি ছুটিতেছে। তিনি এক শতাব্দীতে অমুক জাতির মধ্যে, অন্য শতাব্দীতে আর এক জাতির মধ্যে, অদ্য এই নগরে, কল্য ঐ নগরে প্রবেশ করিলেন তাহা নহে। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী এরূপ নহে। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং সময়ে তাঁহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। পলকের মধ্যে তিনি ভক্তকে দর্শন দেন, পলকের মধ্যে তিনি পাপীর উদ্ধার করেন। তাঁহার ইঙ্গিতে ভক্ত পলকের মধ্যে ভবসাগর পার হইয়া যায়। পলকের মধ্যে নিত্যানন্দের জাহাজ ভবসাগরের এ পার হইতে ও পারে চলিয়া যায়। যখন মন প্রকৃতিস্থ হয়, যখন মন ব্রহ্মযোগে যোগী হয়, তখন পলকের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্গের সুধা পান করে। এই পলকতত্ত্ব বড় মধুর তত্ত্ব। পলকেতে ব্রহ্মের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কোন কার্য্য সমাধা করিতে ব্রহ্মের চেষ্টা কিংবা বিলম্ব হয় না। বিদ্যুৎ অপেক্ষাও ব্রহ্মের কৃপা দ্রুতগামিনী। তাড়িতের গতি অপেক্ষাও ব্রহ্মকৃপার গতি ভক্তকে অধিক বিস্মিত করে। এই অর্দ্ধ মিনিট আগে পাপী নরকের গভীরতম স্থানে পতিত ছিল, আর ব্রহ্মকৃপাবলে এখনই সে আনন্দময়ীর চরণে উপস্থিত। স্বর্গের প্রত্যেক ব্যাপার এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়। পলক অশ্বের উপরে

আরোহণ করিয়া ভক্ত নিমেষের মধ্যে স্বর্গে প্রবেশ করিয়া ঈশা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হন। পলকের মধ্যে ভক্ত সমস্ত স্বর্গ দর্শন করেন, এবং পলকের মধ্যে ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। এই পলক-তত্ত্ব বিশ্বাস কর, কৃতার্থ হইবে। পলকের মধ্যে এ পাপরাজ্য ছাড়িয়া আনন্দ-ময়ী মাকে দেখিতে যাও। মাকে দেখিতে যাইতে দেরি করিও না।

মহাজন মানবজাতির প্রতিনিধি।

রবিবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

লোকবিশেষে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ হয় এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্ত-মান হয়। যাহা সাধারণমনুষ্যমণ্ডলীসম্পর্কে ভবিষ্যৎ, প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট দ্বিজাত্মাদিগের নিকটে তাহা বর্ত্তমান। তোমরা বারংবার শুনিয়াছ, ভবিষ্যদ্বংশ প্রেরিতদিগের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত মহাপুরুষ নাম লইয়া আসেন, তাঁহারা ভবিষ্যতের লোক অর্থাৎ তাঁহারা উন্নত ভবিষ্যদ্বংশের প্রতিনিধি। বহু শতাব্দী পরে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা, বিধাতার নিগূঢ় নিয়মানুসারে মহাপুরুষেরা অকালে সে সকল ঘটনা সঙ্ঘটন করেন। রজনীতে সূর্য্যোদয় একটি অসম্ভব এবং অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার; কিন্তু মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে বাস্তবিক

পৃথিবীর ঘোর অজ্ঞান এবং অধর্ম্মের অন্ধকার রজনীর মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মসূর্য্যের উদয় হয়। যখন সমস্ত পৃথিবী ভয়ানক সংসারাসক্তিরূপ শীতে জীর্ণ, শীর্ণ, সেই সময় যদি স্বর্গ হইতে কোন বৈরাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে পদার্পণ করেন, পৃথিবী তখনই পুণ্যের তেজ এবং বৈরাগ্যের উত্তাপ অনুভব করে। প্রেরিত মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে পৃথিবী স্বর্গ এবং মনুষ্য দেবতা হয়। মহাপুরুষেরা পৃথিবীর রথকে শীঘ্র শীঘ্র স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান। শত শত বৎসর পরে সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ হইবে মহাপুরুষেরা তাহার পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া যান। দুই সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ হইবে মহর্ষি ঈশা তাঁহার জীবনে তাহার পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া গিয়াছিলেন। চারি শত বৎসর পরে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ কিরূপ হইবে, নবদ্বীপে মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন এবং ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বারা যে সকল সুফল ঘটিতেছে, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পূর্ব্বসূচনা করিয়া গিয়াছেন। যে দেশে জাতিভেদের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল, সেখানে উক্ত মহাত্মা তাঁহার প্রগল্ভা ভক্তি এবং উদার প্রেম বলে জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেন। বাস্তবিক সাধু মহাজনের জীবনে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হইয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ পবিত্র ও উন্নত হইবে,

সাধু মহাজনেরা তাহার আদর্শ দেখাইয়া দেন। ভবিষ্যৎ কালে পৃথিবী নিশ্চয়ই স্বর্গ হইবে, ইহা কেবল তাঁহারাই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রচার করেন। তাঁহারাই কেবল স্বর্গীয় উৎসাহের সহিত আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাসবিহীন নিরাশ পৃথিবীকে বলেন;—"সম্মুখে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে যেও না ফিরে।" তাঁহারা নির্জ্জীব অলস পৃথিবীকে দ্রুত-বেগে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান। এই কিছুকাল পূর্ব্বে পৃথিবী বাল্যাবস্থায় ছিল; কিন্তু যখনই পৃথিবীতে এক জন মহাপুরুষ অভ্যুদিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে পৃথিবী যৌবনাবস্থা লাভ করিল। পৃথিবীর রথ কিরূপে এত দূর দৌড়িয়া আসিল? ঘড়ীর কাঁটা এত শীঘ্র কিরূপে স্থানান্তরিত হইল? বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট মহাজন বিদ্যুৎ অপেক্ষাও দ্রুতবেগে মানব-হৃদয়কে আন্দো-লিত ও সঞ্চালিত করেন। মহাজনদিগের সতেজ আত্মা নির্জ্জীবকে নব-জীবন দান করে, নিরুৎসাহকে অগ্নিময় উৎসাহে পূর্ণ করে। যখন এক জন প্রেরিত মহাজন পৃথি-বীর বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দুর্জ্জয় তেজ এবং অটল বিশ্বা-সের সহিত ঈশ্বরের সত্য প্রচার এবং ঈশ্বরের বাক্য উচ্চা-রণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন সহস্র সহস্র লোক সে সকল কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এবং দ্রুতবেগে স্বর্গের দিকে ধাবিত হয়। শত শত লোক আসিয়া সেই মহাজন-মুখ-বিনির্গত সে সকল অমৃতময় এবং অভ্রান্ত

কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দেশদেশান্তরে প্রেরণ করে। তাঁহার প্রচারিত নিগূঢ় স্বর্গীয় তত্ত্বকথা প্রচার করিবার জন্য চারিদিকে দূত সকল প্রেরিত হয়। দূতদি-গের মুখে এবং পুস্তকাদি পাঠে ঐ সকল আশু পরিত্রাণ-প্রদ সংবাদ লাভ করিয়া কোটি কোটি নর নারী অতি সহজে এবং স্বভাবতঃ ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়। সহস্র সহস্র বৎসরেও যাহা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, মহাপুষের শিক্ষা ও যত্নে তিন বৎসরের মধ্যে সে সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। মহাজন দেশ কাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ দেশাচার এবং সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে মহাতেজের সহিত ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করেন। দূরস্থ ভবিষ্যৎ মহাজনের জীবনে বর্ত্তমান হয়। মহাজনের আগমনে পৃথিবীর উন্নতির রথ ভয়ানক নক্ষত্রবেগে ছুটিতে থাকে। দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুই তিন সহস্র বৎসরের কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। মহাপুরুষের তেজ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলে "আমি বর্ত্তমান হইলাম।" দুই সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী যাহা বলিবে, এক জন মহাজন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া তাহা বলেন। মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত! ঈশ্বর স্বয়ং মহাজনের হৃদয়কে হস্ত-গত করিয়া জগতের নিকট তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের শোভা প্রকাশিত করেন। মহাজন আপনার চরিত্রে এবং আপনার জীবনে প্রচুর পরিমাণে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত

করেন। মহাজনের আত্মার স্বর্গীয় লাবণ্য দেখিয়া দূতগণ দেশদেশান্তরে গমন করিয়া বলে, "হে ভাই ভগিনীগণ, আমরা অমুক নগরে এক আশ্চর্য্য মানুষ দেখিয়া আসিলাম, যেমন তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তেমনই তাঁহার আশ্চর্য্য উপদেশ দান করিবার ক্ষমতা, তাঁহার স্বর্গীয় জীবন দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক দ্রুতবেগে স্বর্গের দিকে ধাবিত হই-তেছে।" বাস্তবিক প্রত্যেক মহাজন স্বর্গের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করেন। পৃথিবী যে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই স্বর্গ হইবে, মহাজন আপনার জীবন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করেন। এক জন মহাপুরুষ যদি বলেন "এই আমার বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগে পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল;" বাস্ত-বিক তাহাই হইল। মহাপুরুষের সে উক্তি মিথ্যা হইতে পারে না। অন্ধ অল্পবিশ্বাসী পৃথিবী হয়ত মহাপুরুষের উক্তি অবিশ্বাস পূর্ব্বক উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলে,—"হে সাধুসজ্জন, তুমি বল তোমার বৈরাগ্যে তোমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল! তোমার প্রায়শ্চিত্তে কিরূপে সমুদায় পৃথিবীর প্রায়শ্চিত্ত হইবে?" কিন্তু বিশ্বাসী ভবিষ্যদ্বংশ এক দিন মহাপুরুষের সেই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। বস্তুতঃ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এক জন মহাপুরুষ যে ক্রিয়া সম্পা-দন করেন, সমস্ত পৃথিবী তাহার ফলভোগী হয়। এক জন মহাপুরুষ বলিলেন "পৃথিবী তৃষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-তেছে, স্বর্গরাজ্য কবে আসিবে?" সাধু মুখে এই কথা

শুনিয়া অল্পবিশ্বাসীরা বলিল,—"হে সাধু, 'পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য কবে আসিবে?' এ কথা কেবল তুমিই জিজ্ঞাসা করিতেছ, পৃথিবীর দুর্গতি দেখিয়া তোমারই মনে খেদ হই-তেছে; পৃথিবী বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে না।" অল্পবিশ্বাসীরা মহাজনের মহাবাক্য সকলের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা জানেন মহাজনই পৃথিবী, কেন না তিনি উন্নত মানবমণ্ড-লীর প্রতিনিধি। মহাজন ভবিষ্যতের সন্তান। তিনি আজ যাহা বলিলেন, পৃথিবী চারি সহস্র, আট সহস্র কিংবা ততোধিক সময় পরে তাহাই বলিবে। মহাজনের পরি-ণামদর্শী দিব্যচক্ষের নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহা পৃথিবীর প্রশ্ন বলিয়া তিনি প্রকাশ করিতে পারেন, যদি এক জন মহাপুরুষ বলেন, পৃথিবীর পাপ দুঃখের জলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইল, বিশ্বাস করিতে হইবে যে বাস্তবিক পৃথিবীর জলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইবার সূত্রপাত হইল। যখন ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহ প্রতিভা লাভ করিয়া দুর্জ্জয় সাহসের সহিত বলিলেন "আজ পৃথি-বীর ত্রিতাপ নির্ব্বাণ হইল, আজ পৃথিবীর দুঃখাগ্নিতে শান্তি-বারি বর্ষিত হইল;" তখন তিনি বাস্তবিক সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। সেইরূপ যখন মহর্ষি ঈশা জর্দ্দান নদীর জলে অবগাহন করিয়া বলিলেন "আজ পৃথিবী স্বর্গের পুণ্যজলে অভিষিক্ত হইয়া নির্ম্মল এবং

শীতল হইল, পৃথিবীর সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াইল," তখন তিনি সমস্ত মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আবার যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভয়ানক দস্যুতুল্য জগাই মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন "গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া তোদের গলায় হরিনামের মালা দিব;" তখন তিনি যে কেবল দুই জন পাপীকে আলিঙ্গন করিলেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি সমস্ত পাপীমণ্ডলীর উপর তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের প্রেমবারি বর্ষণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আমি জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিলাম।" ক্ষীণবিশ্বাসী স্বার্থপর লোকেরা বলিল, "পৃথিবী বল কেন? দুইজন বল।" বাস্তবিক অপ্রেমিকেরা জানে না যে, এক দিন জগাই মাধাইয়ের ন্যায় সমস্ত অবিশ্বাসী পাপিমণ্ডলী স্বর্গীয় উদার প্রেমবলে পারাস্ত হইবে এবং পুণ্যজলে স্নান করিয়া কণ্ঠে হরিনামের মালা পরিবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক সাধু মহাজন বিস্তীর্ণ নরমণ্ডলীর প্রতিনিধি। যিনি যে মণ্ডলীর প্রতিনিধি, তাঁহার কথা সেই মণ্ডলীর কথা। তোমরা যদি দলবদ্ধ হইয়া রাজসভাতে তোমাদিগের কোন প্রতিনিধিকে প্রেরণ কর, সেই প্রতিনিধি তোমাদিগের কথা ভিন্ন আপনার কোন কথা বলিতে অধিকারী নহে। প্রতিনিধির নিজের স্বতন্ত্র কথা নাই। এই প্রতিনিধিনিয়োগের রাজ্যতত্ত্ব ধর্ম্মরাজ্যে প্রয়োগ কর। স্বর্গের প্রতিনিধি সমস্ত

মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধি যখন বলিলেন, "এই যে আমি স্নান করিলাম ইহাতে পৃথিবীর স্নান হইল, এই যে আমার প্রাণ শীতল হইল, ইহাতে পৃথিবীর প্রাণ জুড়াইল;" তখন তিনি ভবিষ্যৎ পৃথিবীসম্পর্কে এই কথা বলিলেন। ভবিষ্যৎ পৃথিবী তাহার প্রতিনিধির মুখে এই কথা বলিল। আরও বলি যখন কোন মহাপুরুষ বলেন, "আমি আমার স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রকৃত পুত্রত্বের পরিচয় দিয়াছি এবং পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি এবং আমার সঙ্গে সমস্ত মানবমণ্ডলী ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছে," তখন তিনি পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া এই সত্য প্রচার করেন। ইহা আইনের কথা। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে যত দিন সন্তান জন্মে নাই, তত দিন কেহই তাহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হয় নাই, তত দিন গৃহের সকলেরই মনে বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর মনে এই খেদ হয়, "আহা! কে আমাদিগের এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে?" কিন্তু যখনই সেই বাড়ীতে একটি সন্তান জন্মে, তৎক্ষণাৎ সকলের মন আনন্দে পুলকিত হয়, চারি দিকে আনন্দের রোল উঠিতে থাকে এবং আত্মীয় বন্ধুরা শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গলাচরণ দ্বারা সকলের নিকট পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকরী তনয়ের জন্ম বিজ্ঞাপন করে। তখন ভয় ভাবনা দুঃখ সন্তাপ তিরোহিত হয়। এত দুঃখ পরিশ্রমে অর্জ্জিত ধন সম্পত্তি ভোগ করিবার লোক আসিল, এই মনে করিয়া

সকলের মনে উল্লাস এবং পিতা মাতার মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস হইতে থাকে। পৃথিবীতে মনুষ্যসন্তান তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; স্বর্গেও ঈশ্বরের সন্তান তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। আবার পৃথিবীতে যেমন কুসন্তান পিতার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। যত দিন মনুষ্য নাস্তিক ও ঈশ্বরের অবাধ্য থাকে, তত দিন সে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। ইহা সত্য বটে যে, ঈশ্বরের অনেক কুসন্তান আছে, কিন্তু তাঁহার একটিও ত্যক্ত সন্তান নাই, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য যত দিন কুসন্তান থাকে, যদিও তাহাকে ঈশ্বর পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু সে ঈশ্বরকে ভোগ করিতে পারে না। কুসন্তানকে আপনার সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রায় সকলেরই লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। পৃথিবীর কোন সাধুর কুসন্তানকে যদি তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়, তবে ঈশ্বরের কুসন্তানকে কিরূপে ব্রহ্মপুত্র বলা যাইতে পারে? যিনি পিতার অনুগত, তাঁহাকেই যথার্থ সন্তান বলা যাইতে পারে। সাধুর সন্তান যদি স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য হয়, তাহাকে সেই সাধুর সন্তান বলিতে মনে নানাপ্রকার সঙ্কোচ, ভয়, এবং কষ্ট হয় এবং অনেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে হয়। সাধুর সন্তান অসাধু, ইহা সহজে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলা যায় না। সাধু পিতা এবং অসাধু

সন্তান এই দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ, যেমন স্বর্গ ও নরক আলোক এবং অন্ধকার। নরককে কিরূপে স্বর্গের সন্তান বলা যাইতে পারে ? স্বর্গের সন্তান নরক, ইহা বলিতে উদ্যত হইলেই যেন বাক্যরোধ হয়। পিতা জ্যোতির্ম্ময়, সন্তান অন্ধকার, ইহা কিরূপে সম্ভব ? পুত্রের মধ্যে যদি পিতার কোন লক্ষণ না থাকে, তাহাকে কিরূপে পুত্র বলা যাইতে পারে ? সেইরূপ যিনি ঈশ্বরের অনুরূপ, ঈশ্বরের ন্যায় ঈশ্বরের মত, তাঁহাকেই ঈশ্বর সন্তান বলা যাইতে পারে। যাহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, এবং শান্তি প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ গুলি আছে, তাঁহাকেই ঈশ্বরসন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যাহার মধ্যে যত পরিমাণে ঈশ্বরের এই স্বভাব লক্ষণ গুলি আছে, তিনি তত পরিমাণে ঈশ্বরের সন্তান অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। স্বর্গস্থ পিতার যত টাকা কড়ি অথবা ধন ঐশ্বর্য্য আছে এমন আর কাহারও নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ধনাঢ্য কিংবা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটেরও তুলনা হয় না। এমন ঈশ্বরকে যিনি পিতা বলিয়া ডাকিতে পারেন তাঁহার কত সৌভাগ্য ! "মরি কি সুখের সম্বন্ধ, যিনি মহান্ অনন্ত দেখেন পুত্র ভাবে, মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে, ক্ষুদ্র কীট মানবে দেখেন চাহিয়ে, মরি কি আশ্চর্য্য ভাই রে।" যে বাটিতে এমন ঈশ্বরের পুত্র জন্মে সেই বাটির কত সৌভাগ্য। স্বর্গ

রাজ্যের অধিকারী একটি ব্রহ্মসন্তান জন্মিল ইহাতে সাধুদিগের মনে মহানন্দ। প্রকৃত ব্রহ্মসন্তান কি? অনন্ত জ্ঞানের এক বিন্দু জ্ঞান, অনন্ত প্রেমের এক বিন্দু প্রেম, অনন্ত পুণ্যের এক বিন্দু পুণ্য, অনন্ত সুখের এক বিন্দু সুখ। যদি ধরাতলে স্বর্গস্থ ব্রহ্মখণ্ড দেখিতে চাও, তবে ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন কর। এত বড় ঈশ্বর যাহার পিতা, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী যাহার মা, তাহার আবার ভয় ভাবনা কি? কে বলিতে পারেন, "পবন, আমার কুমার কুমারীকে বাতাস কর, চন্দ্র, সূর্য্য, আমার কুমার কুমারীকে আলোক দেও। নদ, নদী, সমুদ্র, তোমরা আমার কুমার কুমারীর পদ ধৌত কর?" যিনি এমন করুণার সাগর ও প্রতাপান্বিত রাজা, যাঁহার রাজ্যের সীমা নাই, কে না তাঁহার সুসন্তান হইতে ইচ্ছা করিবে? কে ইচ্ছাপূর্ব্বক এত বড় রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে? ঈশ্বরের সুসন্তানই তাঁহার রাজ্যের অধিকারী। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি ভূখণ্ড এবং সমস্ত পৃথিবীর কে অধিকারী হইবে? কেহ কেহ বলে জোর যার মুলুক তার। রুসিয়া যদি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ হয়, রুসিয়া সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার কথা। কেন না প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন অন্য কেহই ব্রহ্মরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। যে দিন প্রকৃত ব্রহ্মতনয়ের জন্ম হইল, সে দিন পৃথিবীর আহ্লাদ হইল, কেন না পৃথিবীর যথার্থ স্বামী এবং অধি-

কারী জন্মগ্রহণ করিল। ঈশ্বরের সাধু পুত্র তাঁহার সমস্ত রাজ্যের অধিকারী, এবং যিনি সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী তিনিই আবার পৃথিবীর প্রতিনিধি। ঈশ্বর তাঁহার সাধু-পুত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পৃথিবীর অধিকার দিলেন। ঈশ্বর তাঁহার বড় পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন;—"তুমি আমার সমস্ত রাজ্য গ্রহণ কর। তুমি তোমার কনিষ্ঠদিগকে ইহার অধিকারী করিও।" যখন আমাদিগের প্রতিনিধি এক জন সাধুপুত্র পিতার স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরাও স্বর্গের অধিকারী হইলাম। স্বর্গে আমাদিগের অধিকার জন্মিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও আমাদের স্বর্গভোগ হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে। এখনও আমরা বালক। যখন বালকত্ব যাইবে, তখন আমরা ভোগাধিকারী হইব। পৃথিবীতে স্বর্গ আসিয়াছে। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা স্বর্গ হস্তগত করিয়া ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে খুব আশা দিতেছেন। যখন এক জন ভাই যথার্থ পুত্রত্বের পরিচয় দিয়া পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তখন আমরা সকলেই সেই সম্পত্তির অধিকারী হইব।। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শুকদেব, নারদ, শাক্য, মুষা প্রভৃতি আমাদিগের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পিতার ধন আনিয়া সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা যথা কালে সেই ধনের ভোগাধিকারী হইব। সাধুদিগের

নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, "ধন্য পৃথিবী, কেন না পৃথিবী স্বর্গের ধনসম্পত্তির অধিকারী হইল!" আমরা জন্মে ঈশ্বরসন্তান, কিন্তু এখনও স্বভাবে ঈশ্বরসন্তান হই নাই, যখন স্বভাব চরিত্রে তাঁহার উপযুক্ত সুসন্তান হইব, যখন দ্বিজ হইব, তখন মঙ্গলময়ী আনন্দময়ী মাকে ভাল বাসিয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্যের ভোগাধিকার লাভ করিব।

স্বর্গীয় উদ্বাহ।

রবিবার ৩১এ শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

আমাদিগের নিকৃষ্ট নীচ জীবনে যাহা কিছু হয় তাহার উপমা, তাহার উচ্চতম আদর্শ, আমরা আমাদিগের অধ্যাত্মিক জীবনে দেখিতে পাই। শরীর এবং আত্মা অথবা পশু এবং দেবতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে, ইহা হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু গভীর ভাবে আলোচনা করিলেই সকলেই ইহা সত্য বলিয়া মানিবেন। চক্ষু দেখে কেন? ভবিষ্যতে আত্মা দেখিবে এই জন্য। শরীরের চক্ষু সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হয়; আত্মার উজ্জ্বল বিশ্বাসচক্ষু স্রষ্টার অরূপ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। কর্ণ শুনে কেন? ভবিষ্যতে আত্মার বিবেক কর্ণ ঈশ্বরের আদেশ শুনিবে এই জন্য। হস্ত ধরে কেন? ইহার গূঢ়

অর্থ এই যে যখন বাহিরে দুটি হাত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন আত্মার ভিতর হইতে ভক্তিহস্ত বাহির হইয়া ব্রহ্মচন্দ্র ধারণ করিবে। পা চলে কেন? পশুও চলে। মনুষ্যের শরীরে দুটি চরণ সংলগ্ন হইল কেন? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ়তর অর্থ আছে। শরীরে যেমন গতিশক্তি দিয়াছেন, বিধাতা আত্মার মধ্যেও গতিশক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, সেই গতিশক্তি দ্বারা আত্মা সতেজে "থাক্‌ব না আর এ পাপ রাজ্যে ব্রহ্মলোকে যাব চলে" এই কথা বলিতে বলিতে দুর্দ্দশা ও অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়া দিব্য ধামে চলিয়া যাইবে। পশুও আহার পান করে, আমরাও আহার পান করি; কিন্তু পশু ও আমাদিগের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? ঈশ্বরের এই গূঢ় অভিপ্রায় যে, আহার পান দ্বারা যেমন শরীরকে সবল পুষ্ট ও কান্তিযুক্ত করি, তেমনি আমরা পুণ্যান্ন ভোজন এবং হরিনামরস আস্বাদন করিয়া আত্মাকে সতেজ হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর করিয়া তুলিব। ভবিষ্যতে আত্মার মধ্যে যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হইয়া কার্য্য করিবে, এখন শরীরের মধ্যে তাহারই অনুরূপ ইন্দ্রিয় সকল সংযোজিত হইয়াছে। উচ্চতর নিরাকার রাজ্যের দিকে লইয়া যাই-বার জন্য, অথবা মনুষ্যকে পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত করি-বার জন্য, তাহার শরীরের মধ্যে বিবিধ ইন্দ্রিয় সকল সংলগ্ন করা হইয়াছে। এ সকল শারীরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন সৃষ্ট জগতের নানা প্রকার গুণ গ্রহণ করা যায়, আত্মার ইন্দ্রিয়াদি

দ্বারা স্রষ্টার গূঢ়তম তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হয়। যেমন আত্মার মধ্যে শারীরিক দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে, তেমনি মনুষ্যের বাহ্যিক উদ্বাহক্রিয়ার সঙ্গে তাহার আন্তরিক উদ্বাহেরও মিলন আছে। প্রকৃত উদ্বাহের অভিপ্রায়, ভাব, কর্ত্তব্য, ব্রত সমুদয় পৃথিবীতে পরিসমাপ্ত হয় না। পৃথিবীর উদ্বাহ একটি সোপান মাত্র। এই সোপান অবলম্বন করিয়া অসংখ্য নরনারী অনন্ত রাজ্যের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন করে। যাহারা শরীরকে বিবাহ করে, তাহারা বিবাহের গূঢ়তর তত্ত্ব জানে না। যাহারা কেবল শারীরিক অথবা সংসারিক সুখভোগের জন্য উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহারা বিবাহের যথার্থ সুখ অনুভব করিতে পারে না। যে সকল নরনারী বিবাহযোগে মিলিত হইয়া অতি নীচ ভাবে জীবনক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাহারা বিবাহের স্বর্গীয় আদর্শ এবং আমোদ জানে না। প্রকৃত বিবাহ আত্মায় আত্মায় যোগ। বিবাহের অর্থ পূরণ। পূর্ব্বে যাহা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ছিল, বিবাহ দ্বারা সেই দুই অর্দ্ধ একত্র হইয়া পূর্ণ হয়। দুই কখন এক হয় না। যাহা অর্দ্ধ ছিল তাহা অপরার্দ্ধের সঙ্গে একত্র হইলে এক হয়। দাম্পত্যপ্রণয়ে যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হয় তাহা দুই জনের ঐক্য নহে। দুই জনের ঐক্যকে পৃথিবীতে বন্ধুতা বলে। পিতা পুত্রের ঐক্য, দুই সহোদরের ঐক্য, কিংবা দুই বন্ধুর ঐক্য, ইহার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর ঐক্যের অনেক প্রভেদ।

উদ্বাহবন্ধন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন; উদ্বাহবন্ধনে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মিলন এত গূঢ় ও গাঢ় হয় যে আর কোথাও তাহার তুলনা নাই। অন্যান্য সকল মিলন অপেক্ষা উদ্বাহের মিলন উৎকৃষ্টতর। যথার্থ উদ্বাহের মিলন উৎকৃষ্টতম। যেখানে স্বার্থত্যাগ করিয়া দুই জন পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করে, সেখানে আমরা স্বর্গের শোভা দর্শন করি ইহা সত্য। যেখানে স্নেহময়ী জননী আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা বহন করিয়া সন্তান পালন করেন, সেখানেও আমরা স্বর্গের সৌন্দর্য্য দর্শন করি। যে কোন স্থানে আমরা নিঃস্বার্থ বন্ধুতা অথবা নিষ্কাম স্নেহ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা স্বর্গের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া পুলকিত হই, কিন্তু বন্ধুতা ও অপত্যস্নেহ অপেক্ষাও উদ্বাহজনিত বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম গাঢ়তর। বন্ধুতা অথবা অপত্যস্নেহে দুই জনের ঐক্য হয়; কিন্তু বিবাহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ মিলিত হইয়া এক হয়। এই অর্দ্ধে অর্দ্ধে মিলন অতি নিগূঢ় রহস্য। নরপ্রকৃতি অর্দ্ধ, নারীপ্রকৃতি অর্দ্ধ, এই দুই অর্দ্ধ একত্র হইলে এক হয়। যত ক্ষণ এই দুই অর্দ্ধ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, তত ক্ষণ প্রত্যেক অর্দ্ধ অপূর্ণ থাকে। যখন এই দুই একত্র হইয়া এক হয়, তখন তাহারা পূর্ণ হয়। যখনই ঈশ্বর অর্দ্ধ সৃজন করিলেন, তখনই সেই অর্দ্ধের মধ্যে ঈশ্বর এরূপ প্রকৃতি দিলেন যে, সেই অর্দ্ধ তাহার অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। যেমন

পৃথিবী আপন স্বভাববশতঃ সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিবেই ঘুরিবে, তেমনি স্বধর্ম্মগুণে অর্দ্ধ নরপ্রকৃতি আপনার অপরার্দ্ধ নারীপ্রকৃতিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। যত ক্ষণ অর্দ্ধ অর্দ্ধ থাকে, তত ক্ষণ সেই অর্দ্ধ সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে, "আমার অপরার্দ্ধ কৈ?" স্ত্রীভাবে, আমার স্বামী কে? পুরুষ ভাবে আমার স্ত্রী কে? পুরুষ বলে আমি কাহাকে স্ত্রী বলিব? স্ত্রী বলে আমি কাহাকে স্বামী বলিব? পুরুষপ্রকৃতি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। এক অর্দ্ধ যত ক্ষণ না তাহার অপরার্দ্ধকে পায়, তত ক্ষণ সে এইরূপ চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। তোমরা মনে কর নরনারীর উদ্বাহের জন্য অনেক ঘটকের প্রয়োজন, কিন্তু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে নরনারীর আপন আপন অন্তরস্থ স্বভাবই তাহাদিগের বিবাহের প্রধান ঘটক। কোন্ দেশের লোককে কোন্ প্রকৃতির পুরুষকে স্বামী বলিয়া বরণ করিবে; কোন্ দেশের নারীকে, কি প্রকৃতির নারীকে পত্নী বলিয়া বরণ করিবে, ইহা কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় না। নরনারী আপন আপন স্বভাবানুসারে পরস্পরকে বরণ করে, সময়ের পূর্ণতা হইলেই এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়। মনের প্রস্ফুটিত অবস্থায় আত্মা আপনার স্বামী কি আপনার স্ত্রীকে চিনিয়া লয়। এক অর্দ্ধ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া আমোদ প্রমোদ করে তখন সে বলে আমার এই আমোদ প্রমোদের এক জন অংশী চাই।

সে তাহার হৃদয়ের বাগানবাড়ী সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, কখন অপরার্দ্ধ আসিয়া তাহার বাড়ী অধিকার করিবে এবং তাহার আমোদপ্রমোদের ভাগী হইবে। পুরুষ সহধর্ম্মিণী এবং স্ত্রী ধর্ম্মপতি অন্বেষণ করে। প্রত্যেকেই বলে, "আমি ধর্ম্মসাধনের এক জন সহায় চাই। যোগাসনে বসিয়া যখন আমি পরমেশ্বরকে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিব, তখন আমার সেই অপরার্দ্ধ আমার সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিবে।" কেহ কেহ বলে বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ। কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইবে ইহা বিধাতা পূর্ব্বেই তাহাদিগের কপালে লিখিয়া রাখেন। যাহা ভবিতব্য, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। বাস্তবিক এ বিধান এক ভাবে কপালে লেখা আছে, আর এক ভাবে কপালে লেখা নাই; অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ সঙ্গত তাহা পূর্ব্বেই তাহাদের প্রবৃত্তিতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তিনি কাহারও কপালে সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন্ অথবা অন্য কোন ভাষায় পাত্র পাত্রীর নাম লিখিয়া দেন নাই। তাঁহারই ইঙ্গিতে, তাঁহারই নিয়মে, এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়। যখন এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধের সঙ্গে মিলিত হইয়া একমন, একাত্মা এবং একপ্রাণ হয়, তখন স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হয় এবং প্রেমভেরী বাজে। উদ্বাহবন্ধনে এইরূপে দুই অর্দ্ধ একাত্মা হওয়াই প্রকৃত বিবাহ। এই বিবাহে যাহা পূর্ব্বে বিধাতার লেখা ছিল তাহা পূর্ণ হয়

বিধাতার অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়। যাহারা বিবাহকে সামান্য সাংসারিক অথবা শারীরিক ব্যাপার মনে করে, তাহারা প্রকৃত বিবাহতত্ত্ব জানে না। শরীরের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি যেমন আত্মার ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ, ব্রহ্মস্পর্শ, আত্মার গতিশক্তি প্রভৃতির অনুরূপ, সেইরূপ বিবাহ অথবা নরনারীর মিলন জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যোগের অনুরূপ। পৃথিবীতে যেমন নরনারীর বিবাহ হইতেছে, স্বর্গে সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইতেছে। এক দিন ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী যোগেশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার বিবাহ হইবে বলিয়া পৃথিবীতে কোটি কোটি বিবাহ হইতেছে। সামান্য পশু যেমন আর একটি পশুর সঙ্গে থাকে, নরনারীর বিবাহ সেরূপ নহে। নিকৃষ্ট জীব এবং পশুদিগের মধ্যে প্রণয় আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পাখীর প্রণয় আছে, জন্তুর প্রতি জন্তুর প্রণয় আছে; কিন্তু সেই প্রণয়ের সহিত দাম্পত্যপ্রেমের তুলনা হইতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রণয় চিরস্থায়ী, এবং যোগী ও যোগেশ্বরের প্রেমের অনুরূপ। বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় স্বর্গের পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করে। শত সহস্র বৎসর পরে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার যে সম্বন্ধ হইবে, স্বামী স্ত্রীর পবিত্র প্রণয় সেই সম্বন্ধের পরিচয় দেয়। পৃথিবীতে পুরুষ যেমন "আমার স্ত্রী কৈ?" স্ত্রী যেমন "আমার স্বামী কৈ?" এই বলিয়া ব্যাকুল হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও এক দিন পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পার্থি-

লের ন্যায় বলিবে, "আমার প্রাণপতি কৈ? আমার প্রাণেশ্বর কৈ? আমার প্রাণকান্ত হৃদয়রঞ্জন কৈ?" বাস্তবিক উন্নত পরিপক্ক অবস্থায় বিবাহের জন্য আত্মা পাগল হয়। পরমাত্মার জন্য ব্যাকুলিত আত্মা উন্মাদের ন্যায় বলে, "অবিবাহিত অবস্থায় কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমার একতারা, ধর্ম্মগ্রন্থ, গৈরিক বসন প্রভৃতি সকলই আমার নিকটে আছে; কিন্তু আমার প্রাণেশ কৈ? কবে তাঁহার সঙ্গে বিরলে বসিয়া যোগানন্দরস পান করিব? কবে তিনি আমি একাসনে বসিয়া প্রেমালাপ করিব? কবে মিশে নদী জলধিতে হবে একাকার?" বাস্তবিক স্বর্গপতি, সর্ব্বপতি, বিশ্বপতি, প্রাণপতি ঈশ্বরের সঙ্গে গূঢ় প্রাণগত যোগ স্থাপিত না হইলে জীবাত্মা কিছুতেই প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে না। জীবাত্মা তাঁহাকেই বিবাহ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরম সুন্দর প্রেমময় হরি প্রত্যেক জীবাত্মার বর। তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেই জীবের সুখ। তাঁহার মত প্রাণের সুহৃৎ ও সর্ব্বসুখদাতা আর কেহ নাই, তিনিই পূর্ণ সুখ। অতএব সকলে সেই সত্য শিব সুন্দর, সেই শ্রেষ্ঠতম বর, সেই ভুবনমোহন পরমসুন্দর হরিকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতি উভয়ের পতি এবং উভয় জাতির পূজনীয় ও সেবনীয় দেবতা। তাঁহার সঙ্গে বিবাহরূপ গূঢ় প্রেমযোগ না হইলে কেহই নিত্য

সুখের অধিকারী হইতে পারে না। হে জীব, নিকৃষ্ট শরীরের বিবাহকে স্বর্গীয় বিবাহে পরিণত কর। উৎকৃষ্টতম বিবাহের পথ, শ্রেষ্ঠতম যোগের পথ, অবলম্বন কর। নীচ ঐহিক সুখলালসা নির্ব্বাণ করিয়া সেই পূর্ণানন্দ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাযোগ নিত্যযোগ সাধন কর। এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমসুন্দর মৃত্যুঞ্জয় বর বর্ত্তমান থাকিতে কেন নিকৃষ্ট মরণশীল পাত্রে অনুরক্ত হইবে? স্বামী স্ত্রীকে বলুন,—"হে ধর্ম্মপত্নি, আমার হৃদয় তোমার হউক।" স্ত্রী স্বামীকে বলুন—"হে ধর্ম্মপতি, আমার হৃদয় তোমার হউক।" আবার স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মিলিত হইয়া বলুন,—"আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।" এইরূপে নরনারী উভয়ে ব্রহ্মবরকে পতিত্বে বরণ করিয়া নিত্য সুখ ভোগ করুন।

ধর্ম্মরাজ্যের সীমানির্ণয়।

রবিবার, ২৭এ ভাদ্র, ১৮০৩ শক।

ঈশ্বর যাহাদিগকে সত্যান্বেষণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট আমার আজ একটি প্রস্তাব আছে। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে একটী সীমা আছে; সেই সীমা লইয়া চিরদিন বিবাদ হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে। সত্যরাজ্যের যথার্থ সীমা নির্ণয় করিয়া বিবাদের মূলোৎপাটন করা আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তার কত দূর, রাজ্য-

বাসী অনেকেই তাহা জানে না। ধর্ম্মরাজ্যে আছি, ইহা অনেকেই জানেন; কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে সীমা কত দূর তাহা অল্প লোকেই অবধারণ করিয়া থাকেন। সীমা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কে না নিজের বাটির সীমা জানে? কোন্ প্রজা না ভূমির সীমা ঠিক করিয়া রাখে? রাজা জমীদার প্রভৃতি সকলেই জমীর সীমা চিহ্নিত করিয়া রাখেন। এসম্বন্ধে বিবাদ অনিষ্টের কারণ। এই সীমা লইয়া প্রতিবেশিগণের সহিত বিবাদ হইতে পারে। ধর্ম্ম-রাজ্যের সীমার শেষ যেখানে, সেইখানে অসত্য ও অধর্ম্ম। সীমার এক চুল বাহির হইলে অসত্যের ভিতর, পাপ হ্রদের ভিতর পতিত হইতে হয়। এক চুল ধর্ম্মরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেই যেখানে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক প্রভেদ, পাপের অত্যাচার, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ষড়্‌রিপু সেখানে ছয় রাজা হইয়া প্রজাদিগকে অনবরত অতিশয় কষ্ট দিতেছে। আমাদের এক অঙ্গুলি ভূমি তাহাদের হস্তগত হইলে যে কত কষ্ট হইবে, তাহা বলা যায় না। পাছে অসত্য, অন্ধকার ও ভ্রমের হস্তে পড়িতে হয়, পাছে বিদেশে পাঁচ জন দানব আমাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, এই ভয়ে আমাদিগের হৃৎকম্প হয়। আমাদিগকে সতত সাবধান থাকিতে হইবে। আমাদিগের ভূমির এক খণ্ডও অপরকে দিব না। আমাদিগের রাজার আদেশ আছে, এক খণ্ড ভূমিও পরাধিকারে যাইতে

রিবে না। রাজ্যের কুশলভঙ্গ যাহাতে না হয়, সে জন্য দুরন্ত প্ররোচনাকারীদিগকে দূরে রাখিতে হইবে। যাহারা সত্যের শত্রু, তাহারা বলে বা কৌশলে আমাদিগের ভূমি হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। বল প্রকাশ করিয়া যখন কৃতার্থ না হয়, তখন কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। এ প্রদেশের জমীর মূল্য ইহার লক্ষ ভাগের এক ভাগের তুল্যও নহে, এখানকার ভূমি সাত রাজার ধন। ইহা হস্তগত করিবার মানসে কেহ কেহ তোমাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য কয়েকটি মত প্রকাশ করিবে। সেই সকল মত শুনিতে মিষ্ট, সরল ও মনোহর। সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া তোমাদিগের মন হরণ ও সম্পত্তি হরণ করিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য এক্ষণে তোমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব, সীমা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কয়েকটি লোককে চিহ্নিত কর। তাঁহারা যোগের সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন, ভক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন, অসাম্প্রদায়িক প্রেমের সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, কোন্ পথে কত দূর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এই সকল বহুমূল্য তত্ত্বভূমির চারি সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এজন্য লোক মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগের উপর বিশেষ বিশেষ ভার দিয়া চারি দিকে ত্বরায় প্রেরণ করিতে হইবে। কোন্ দিকে কত ভূমি আছে, কোন্ সাগরে কত দ্বীপ আছে, ভূগোল শাস্ত্রে এ সকল লেখা আছে। জল স্থলের পরিমাণ

যত দূর অনুসন্ধান দ্বারা ঠিক করা হইয়াছে, তাহা ভূগোলে জানা যায়। লোক কিরূপ, তাহাদিগের আচার ব্যবহারই বা কিরূপ, সকলই তাহাতে অবগত হওয়া যায়। তথাপি দেখ, জ্ঞানীদিগের কৌতূহল তৃপ্ত হইল না। সাগর মহাসাগরে যাত্রা করিয়া ভূখণ্ড সকল আবিষ্কার করিবার জন্য কত জাহাজ প্রেরিত হইতেছে। ভূমি আবিষ্কার জন্য কত উপযুক্ত লোকদিগকে পাঠান হইতেছে। উত্তর মহাসাগরে অজ্ঞাত প্রদেশে এমন কোন ভূমি আছে কি না দেখিয়া আইস, যেখানকার কথা ভূগোলে লিখিত হয় নাই, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। যাও, যথোপযুক্ত লোক জন সঙ্গে লইয়া যাও; ছয় মাস বা এক বৎসরের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাও। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগকে সঙ্গে লও; প্রয়োজনীয় যন্ত্র সকল সঙ্গে লও। এই প্রকার অনুজ্ঞা বাহির হইল। ভূগোলের উন্নতির জন্য যে সকল সভা ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা এই প্রকারে দলে দলে লোক প্রেরণ করিতেছে। খুলিল জাহাজ; সকলে কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে জাহাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কি সংবাদ আনিবে কেহই তাহা জানে না। হয়ত সাগরের মধ্যে লোকগুলি মরিবে। তথাপি তাহারা চলিল, মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিবার জন্যই হয় তো অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া বিজ্ঞানের রাজ্য আবিষ্কার করিবার জন্য চলিল। পৃথিবীর ভূমি যে কত দূর বিস্তীর্ণ, তাহা এখনও

বুঝিতে পারা যায় নাই। এমন অনেক স্থল আছে, যাহার সহিত কোন যোগসাধনে এখনও আমরা সক্ষম হই নাই; এজন্য আবিষ্কারের বার বার চেষ্টা হইতেছে। মধ্য আফ্রিকার উষ্ণ প্রদেশে কত লোক প্রেরিত হয়। আফ্রিকার মধ্যস্থল কি চিরকালই অন্ধকার আবৃত থাকিবে? পর্ব্বতের উচ্চ শিখর সকলও আবিষ্কৃত হইতেছে। ধর্ম্মরাজ্যে এইরূপ হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানের উচ্চ প্রদেশে ভক্তির শীতল রাজ্যে, যোগগিরির উচ্চতম স্থানে কত দূর সাধকেরা গমন করিতে পারেন এবং কোন্ সীমা অতিক্রম করিলে আর বাসযোগ্য ভূমি পাওয়া যায় না, তান্নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। গ্রীন্লণ্ডের উত্তরে ভয়ানক শীতের মধ্যে আরও দেশ আছে কি না, তাহাও নির্দ্ধারণের জন্য কত চেষ্টা হইতেছে। উহা দ্বীপ কি উপদ্বীপ আমাদিগের জানা উচিত। মনুষ্য আবাসের উত্তর সীমা আমাদিগের জানা উচিত, কোথায় অত্যন্ত অসহ্য শীত, লোক নাই, লোক থাকিতে পারে না, জীব জন্তু একটিও দেখা যায় না। যোগে যদি আত্মা নিস্পন্দ হয়, তবে যে কত দূর পর্য্যন্ত গেলে সহিবে না তাহা ঠিক করিয়া জানিতে হইবে। যোগে কি আত্মা অবসন্ন হইয়া যায়? নিশ্বাস কি আবদ্ধ হয়? যোগের দ্বারা শরীরের কি কিছু অনিষ্ট হয়? কত দূর পর্য্যন্ত যোগের রাজ্যে যাওয়া যায়? যাও যোগের উচ্চতর শিখরে যাও! কত দূরের পর আর যোগ নাই, আর যোগ হইতে পারে না,

তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখ। কেহ বলে, এই গিরি পর্য্যন্ত যোগ হইতে পারে, আর নয়। ইহার উপর কোন ঋষি কখন গমন করেন নাই। ইহার উপর উঠিলেই উচ্চ আকাশে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মানুষ মরিয়া যায়। নববিধান-সঙ্গত যোগবলে কত দূর উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বিধানবাদীর যোগসাধনের সীমা কত দূর পর্য্যন্ত? ভক্তিসাধনের সীমাও ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। এতটা প্রেমে কাঁদিলে বাঁচিব, ইহার অধিক হইলেই মরিব। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নৃত্য করিলে ঠিক। তিন ঘণ্টা নৃত্য করিলে যে হইবে না ইহা কে বলিল? ভক্তির উত্তর সাগরে কত দূর সাধকেরা যাইতে পারেন এবং উহার শেষ সীমা কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ কর। অর্দ্ধ ঘণ্টা ধ্যান করিলে সভ্যতা বলিবে "যথেষ্ট, আর অধিক হইলে সভ্যতার সহিত বিরোধ হইবে। প্রাচীন কালের মূর্খেরা পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিত। এখনকার সময়ে তাহা আর উচিত বলিয়া বোধ হয় না।" বাস্তবিক কি পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিলে ভ্রম ও অন্ধকারে পড়িতে হয়? সত্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেই মিথ্যা রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, অন্ধকারের মধ্যে পড়িতে হয়, মিথ্যা-বাদিদিগের সঙ্গে গণ্য হইতে হয়। পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিয়া দেখ সত্যের সীমা আরও বিস্তৃত কি না। কোন্ খানে কল্পনা কোন্ খানে ধ্যানের আরম্ভ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ধ্যান ও ব্রহ্মদর্শন এক দিকে, অনুমান ও

ছায়াদর্শন অপর দিকে, ইহার মধ্যে যে রেখা আছে তাহা ঠিক কর। সদাচার ও সদনুষ্ঠানের সীমা কত দূর, তাহা ভাল করিয়া জান। আমরা বলি ঈশ্বরকে জানা যায়, এক জন বলিবে জানা যায় না; আর এক জন বলিবে কতক জানা যায়, কতক জানা যায় না। যত দূর জানা যায় তাহা কি জানা হইয়াছে? এক জন বলিল, সত্যসূর্য্যের কাছে গেলে মরিবে। কত কাছে যাওয়া যায়, তাহা দেখা আবশ্যক। শীত দেশে উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ নিষিদ্ধ। তবে কি পাহাড়ের কাছে আর যাইব না? তবে কি শীত দেশে একেবারে যাওয়া হইবে না? এত ভয়? এত ভয় ভাল নহে। এখনও কত শিখিতে হইবে! বিধানের শ্রীমদ্ভাগবতের কি শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে? চারি বেদ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে? যোগপর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে কি গিয়াছিলে? যত দূর যাই-বার তত দূর কি গিয়াছিলে? নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কেন? ব্রাহ্ম-দিগের এখন নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, আরও কত ধর্ম্মলাভ করিবার অবশিষ্ট আছে? আরও কত ঘণ্টা নিমীলিতনয়নে ধ্যান করিতে পার, তোমরা জান না। আগে পাঁচ মিনিট ধ্যানই যথেষ্ট বোধ করিতে; অর্দ্ধ ঘণ্টা হইল, এক ঘণ্টাও হইল, সমস্ত দিন উৎসব হইল। এখন বলি, আরও আরও যোগের উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করা যায়। ধর্ম্মরাজ্যে আরও শত শত দেশ আছে, যাহার নাম গন্ধও আমাদের নিকট

আসে নাই। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান আছে; প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর স্থান আছে, গভীর হইতে গভীরতর স্থান আছে। তোমাদের মধ্যে সুদক্ষ সুনিপুণ যাঁহারা তাঁহারা সত্য লাভ করিবার জন্য সাধন আরম্ভ করুন; অল্পবিশ্বাসী ও ভীরুদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করুন। চারি দিকে দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিন, নববিধানবাদী আত্মরক্ষা করিয়া কত ঘণ্টা ও কিরূপে ব্রহ্মযোগসাধনে অতিবাহিত করিতে পারেন। কত ঘণ্টা সাধন করিলে কোন বিশৃঙ্খলা হয় না, শরীর ঠিক থাকে, মন ঠিক থাকে, হৃদয় ঠিক থাকে, আত্মা ঠিক থাকে। যখনই দেখিবে ঠিক নাই, তখনই বুঝিতে হইবে, সীমার ও দিকে গিয়াছে। অমনি ফিরিবে, সীমার বাহিরে যাইবে না। যদি দেখ, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, শরীরে রোগ সঞ্চার হইল, স্বাস্থ্য নষ্ট হইল, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, বুঝিবে শত্রুরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছ। অমনি ধর্ম্মরাজ্যে ফিরিবে। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, ধ্যান করিয়া একেবারে ঠিক সীমা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে। ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, যথার্থ ব্রহ্মবাদী এত সময় যোগাসনে বসিয়া উৎকৃষ্টরূপে ব্রহ্মযোগ সাধন করিতে পারেন। নির্ণয় করিবে, কি ভাবে চলিলে জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা ও আত্মার সমস্ত সদ্ভাব রক্ষা পায়। পাঠসম্বন্ধেও নিরূপণ করিবে, ব্রহ্মরাজ্যে কত দূর পাঠাভ্যাস করা যায়। যে-জ্ঞানে বিশ্বাস নষ্ট হয়, সে জ্ঞান জ্ঞান নহে, সে জ্ঞান

আমাদের নয়। বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিব, অথচ দেখিব প্রেম মরিল না। যদি দেখি পড়িতে পড়িতে প্রেম চলিয়া গেল, পুস্তকের কীট হইয়া পড়িলাম, বুঝিতে হইবে, শত্রুরাজ্যে পড়িয়াছি। তেমনি আমরা কর্ম্মসম্বন্ধেও সীমা নির্ণয় করিব। কত কর্ম্ম করিতে পার? শুনিয়াছি, কার্য্যালয়ে পাঁচ ঘণ্টা, সাত ঘণ্টা লোকে পরিশ্রম করে। ব্রহ্মবিশ্বাসী কি আরও পারেন? পার যদি দেখাও। প্রাতঃকাল হইতে পরিশ্রম কর, মধ্যাহ্নে পরিশ্রম কর, রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম কর। সারা দিন খাটিয়া কার্য্যালয় হইতে আসিয়া মৃদঙ্গ বাজাও, ভক্তির সহিত কীর্ত্তন কর। তোমরা হয়তো বলিবে শরীর এখন ভক্তিভার বহন করিতে পারে না। কি? ভক্তি ভার? নিশ্চয় তবে তোমরা ধর্ম্মের রাজ্য অতিক্রম করিয়াছ। মৃদঙ্গে কি ভার আছে? ভক্তিকে তুমি ভার বল? তুমি তবে ব্রহ্মরাজ্যে পরিশ্রম কর নাই। সংসারের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। ঈশ্বরচরণে তুমিত আত্মসমর্পণ কর নাই। ব্রহ্মরাজ্যে যদি পরিশ্রম করিতে, হরিনাম করিতে, ভার বোধ হইত না; হাসিতে হাসিতে হরিনাম করিতে। কর্ম্ম করিলে কি মন নিরানন্দ হয়? না আরও আনন্দ হয়, শরীর আরও সতেজ হয়। পরিশ্রম কি জন্য? শরীর মনের বল ও তেজ রক্ষার জন্য। এই কথা শুনিয়া আবার অনেকে বলিতে পারেন, তবে আর দুই ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিব না। নববিধানে জানিয়াছি, অধিক

পরিশ্রম করিয়া উপাসনার ভাব, ভক্তির ভাব হারাইলে বড় অন্যায় হয়। এই বলিয়া যে কেহ ধর্ম্মের ভূমি সঙ্কীর্ণ করিতে যাইবেন, তাহা হইবে না। যেখানে দশ সহস্র লোকের স্থান আছে, সে স্থানকে তুমি দুই শত লোকের উপযুক্ত মনে করিবে? তুমি ব্রহ্মরাজ্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিবে? বল, আরও পরিশ্রম করা যায়। কিয়ৎ কাল সাধকেরা এক বার দেখিয়া আসুন, পরে বলুন, ব্রাহ্ম হইয়া এত পরিশ্রম করা যায় কি না? বলুন, এত অধিক যোগ ভক্তি সাধন করা যায়, এত শারীরিক পরিশ্রম করা যাইতে পারে। কত অধিক যোগসাধনে ও শারীরিক পরিশ্রমে মনুষ্যহৃদয় নির্ম্মল ও আনন্দিত রাখা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। এক এক দল, এক এক প্রদেশে বাহির হইয়া চলিয়া যাউন। আমাদের সকলের শুভাশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা লইয়া উৎসাহের সহিত পূর্ব্ব পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে চলিয়া যাউন। ফিরিয়া আসিয়া প্রেম ভক্তি যোগ প্রভৃতির তত্ত্ব সকল বলিবেন। আমরা তাহা শুনিয়া আমাদের সাধনের পরিমাণ বাড়াইব। যদি জানিতে পারি, যোগপাহাড়ের অমুক স্থান, ভক্তিনদীর অমুক অংশ আমাদের অবিদিত রহিয়াছে, সংবাদ দিলেই আমরা কৌতূহল-পরায়ণ হইয়া দৌড়িব। সকলে সেই সকল স্থান দেখিবার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিব। পাঁচ ক্রোশ দূরে যোগের পাহাড় রহিয়াছে, বড় বড় ভক্তির উদ্যান রহিয়াছে,

আমরা কিছুই দেখি নাই। অতি উৎকৃষ্ট স্থান, আমরা তাহার নিকটে গিয়া হয়ত ফিরিয়া আসিয়াছি; এমন সকল স্থান আমরা দেখিতে পাইব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা অগ্রে দেখিয়া আসিবেন। নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় পুষ্প আনয়ন করিবেন। সাগর মহাসাগর প্রভৃতি হইতে নানা-বিধ রত্ন বহুমূল্য রত্ন আনিয়া দেখাইবেন। ভক্তিকানন হইতে, প্রমোদ উদ্যান হইতে মধু আনিবেন। আমরাও পরে কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে সেই দিকে গমন করিব। কি আশ্চর্য্য! কি দুঃখের বিষয়! সীমা জানি না বলিয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকি। একটি মৃদঙ্গ আমি যথেষ্ট মনে করি, পাঁচ জনে পাঁচটি কেন বাজাইলাম না? পাঁচ ঘণ্টা অনবরত ধ্যান করা যায়, আমি কেন করিলাম না? রে নির্ব্বোধ মন, সীমা জান না বলিয়া দক্ষিণে এক হস্ত, বামে এক হস্ত স্থান লইয়াই বুঝি সাধন করিয়া সময়াতিপাত করিতেছ? পাঁচ মিনিট ধ্যান হইলেই খুব হইল, মনে করিতেছ? ঐ একটু স্থানেই কি চির দিন বদ্ধ থাকিবে? সঙ্কীর্ণ ভূমির মধ্যেই বিচরণ করিবে? এত বড় ব্রহ্মরাজ্য! তুমি ইহাকে ছোট মনে কর? এবার মোহশৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যাউক। অজ্ঞান অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যাউক। স্বাধীন হইয়া যোগ পাহাড়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে হইবে। কত দূর যোগে উন্নত হওয়া যায়, কত দূর ভক্তিতে মগ্ন হওয়া যায়, কত অধিক পরিশ্রম করা

যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। ধর্ম্মরাজ্যের সীমা নির্ণয় করিবার জন্য এক দল লোক বাহির হইয়া পড়। সত্য ও অসত্যের মধ্যে যেখানে রেখা আছে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে যেখানে প্রভেদ চিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হও। সীমার বাহিরে গেলে মহাবিপদ। অতএব ব্রহ্মদেশ কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা অবধারণ করিয়া সাধারণকে জানাইতে হইবে। যাঁহারা জানাইবেন ও যাঁহারা জানিবেন, তাঁহারা সকলেই ধন্য হইবেন। এই ক্ষেত্রে যাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া গমন করিবেন, তাঁহারা গভীর সাধনে প্রবৃত্ত হউন, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ও আমাদের শুভকামনায় চারি দিকের নূতন নূতন রাজ্য আবিষ্কার করিয়া আনন্দ সমাচার বিস্তার করুন।

পার্ব্বতীবিদায়।

রবিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক।

পার্ব্বতি, তুমি কি এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া স্বামীর আলয়ে গমন করিবে? অদ্য রজনী অবসান হইলে দশমীর সমাগমে বঙ্গদেশে এই গম্ভীর প্রশ্ন উত্থিত হইবে; বঙ্গীয় নরনারীর চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হইবে। আদরের দুর্গাকে তিন দিবস তিন রাত্রি যথোচিত ভক্তি

সম্মান প্রদান করিয়া অবশেষে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। আনন্দের উৎসব, হে বঙ্গদেশ, প্রায় শেষ হইল। আনন্দের বাজার ভগ্নপ্রায়। যাহার দুর্গা সেই লইয়া যাইবে; তোমার শাস্ত্রেই বলিতেছে। (কেবল তিন রাত্রি উৎসব, চতুর্থ রাত্রি কি ভয়ানক! সেই বেদী শূন্য হইবে, সেই গৃহস্থের বাটী আনন্দবিহীন হইয়া পড়িবে। বিচ্ছেদ!!! বিচ্ছেদ!! বিচ্ছেদ!!! কাল এই মহাবাক্য তিন বার উচ্চারণ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বাস্তবিক সংসারে কেবলই বিচ্ছেদ, কিছুই স্থায়ী নহে।(তিন রাত্রির পর কিছুই থাকে না। সম্পদ থাকে না; ধন থাকে না; স্ত্রী পুত্র পরিবারও থাকে না, ঈশ্বরও কি থাকেন না? তোমার আদরের ঈশ্বর যিনি, তিনিও কি থাকেন না? তিনিও কি চলিয়া যান? যান কোথায়? পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে? দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী গালে হাত দিয়া কাঁদিবে। ধন আসে, ধন যায়; সম্পদ আসে, সম্পদ যায়; তিন রাত্রির পর মদের সুখ, পাপের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ চলিয়া যায়। তিন রাত্রির পর সাংসারিক বিলাস মজা কিছুই রহিল না। কেহই রহিল না। ঈশ্বরও কি সেই দলে পড়িলেন? মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইব যাঁহার কৃপায়, তিনিও কি মৃত্যুর অধীন হইলেন? এই যে দেবী ঠাকুর দালান সুশোভিত করিয়াছিলেন, এই চলিয়া গেলেন! ভয়ানক অন্ধকার! বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া আর কি দালানের পানে কেহ তাকাইতে

পারে? চক্ষু কি আর ও দিকে রাখা যায়? কিন্তু নগরের ঘরে ঘরে এই ব্যাপার। দুর্গাকে হারাইয়া দেশ শোক, সন্তাপ ও বিচ্ছেদজ্বালায় আবার এক বৎসরের জন্য অধীর হইল। বঙ্গদেশবাসী আপনার ঘরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে এ সকল স্বপ্ন না সত্য? ভ্রম না যথার্থ? এ কি অনুমান, ভ্রান্তি মনকে মিথ্যা কষ্ট দিতেছে, না সত্য সত্যই হৃদয়ের, পরমাত্মা পাখী উড়িয়া গেল? স্ত্রী যায় স্বামীর বাড়ীতে; বউ যায় বাপের বাড়ীতে; দেবীরও কি মানুষের ন্যায় ব্যবহার? দেবীও কি বৎসরান্তে স্বামীকে ছাড়িয়া পিত্রালয় যান ও পিত্রালয় ছাড়িয়া স্বামীর আলয়ে গমন করেন? দেবীর আবার নিজের ও পরের আলয় কি? তাঁহার আবার পতিগৃহ পিতৃগৃহ কি? দেবী কি আসেন যান? দেবী-সম্বন্ধে কি এ সকল লৌকিক আচার খাটে? যেখানে দেবত্ব, সেখানে সর্ব্বব্যাপিত্বের ভাব। সেখানে বিচ্ছেদ কি? আসা যাওয়া কি? শান্ত হও, বঙ্গদেশ! শান্তচিত্ত হইয়া অনুধাবন কর। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া গূঢ় রহস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হও। মহাদেবের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না হইয়াছেন যে সতী, মহাদেবের স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক হইয়াছেন যে দেবী, তিনি বঙ্গদেশে আরাধিত হইবার জন্য আসিয়াছেন। শ্বশুরধাম পরিত্যাগ করিয়া আপন ধামে, স্বধামে আগমন করিয়াছেন। সতীর প্রকৃত বাসস্থান পতির কাছে। মহেশ্বরের সহিত প্রকৃতির বিবাহ

যোগ। যথা মহেশ্বর, তথা দেবী। এইত স্বভাব বলে, আমাদিগের সহজ বুদ্ধি বলে। কিন্তু প্রকৃতি কেবল মহেশ্বরের সহিত থাকিলে আমাদিগকে কৈলাস যাত্রা করিতে হয়। মহাদেব বাস করেন কৈলাসে, যোগধামে। এখান হইতে কৈলাসে যাইতে হইবে। পথ প্রদর্শক নাই, নেতা নাই, পাণ্ডা নাই। সেখানকার লোক আসিয়া যে এখান হইতে যাত্রী লইয়া যায়, এরূপ ত শুনি নাই। বৃন্দাবনের লোক এখানে আসে; কাশীর পাণ্ডা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডারাও পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চারি দিকে বেড়ায়। নেতার হাত ধরিয়া জগন্নাথক্ষেত্রেও যাওয়া যায়, শ্রীবৃন্দাবনেও যাওয়া যায়। অন্যান্য তীর্থভ্রমণের জন্য সমুদয় সুযোগ আছে; কিন্তু কৈলাস হইতে কে আসে? বঙ্গদেশের ইতিহাসপাঠক, বল কখন কি কেহ তথা হইতে আসিয়াছে? মহাদেবের নিকট লইয়া যাইবার জন্য পথপ্রদর্শক কে আসে? সেখানে কি যাত্রিদল যায়, না সন্ন্যাসীরা একা একা যায়? পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। বড় দুর্গম স্থান! কৈলাসধাম নির্জ্জনসাধনের স্থান, যোগীদের তপস্যার স্থান। বঙ্গদেশ সেখানে কিরূপে যাইবে? বঙ্গদেশ তথায় যাইতে পারে না, যাইতে চায়ও না। যদি বঙ্গদেশ যাইতে পারিল না, মহাদেব বলিলেন, "যাও পার্ব্বতি, তুমি বঙ্গদেশে যাও।" কঠোর সন্ন্যাসী

যোগেশ্বর বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কোমল প্রকৃতি বঙ্গে আরাধিত হইতে আসিলেন। অখণ্ড ব্রহ্ম চিন্তাতে দুই খণ্ড হইলেন। যোগী এবং সতী; সতী এবং যোগী। কাহাকে চায় বঙ্গদেশ? ঘোর সন্ন্যাসী হইবার যদি ইচ্ছা থাকিত, সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য বঙ্গবাসিগণ কৈলাসে গমন করিত। এখানে? এখানে চায় মহাদেবের ভার্য্যাকে, মহাদেবের সুলভ অংশকে; গৌরী, পার্ব্বতী, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনীকে। দুর্গতিনাশক? না; মহেশ্বরী, সতী, দুর্গতিনাশিনীকে সকলে চায়, অন্ধকারনাশিনী, শমনবিনাশিনী, স্ত্রীপ্রকৃতি, প্রেমদায়িনী, কোমলাঙ্গী,—কঠোরাঙ্গ নয়। ভক্তি চাই, সন্ন্যাস নয়। গৃহস্থের বাড়ীর বালক বালিকা যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে, তিনি আসুন, বাবা বলিয়া পাহাড়ের উপর চীৎকার করিয়া যাঁহাকে সন্ন্যাসীরা ডাকে, সে দেবতা নয়। দেব নয়, দেবী। বঙ্গদেশ এই নিবেদন করিল; স্বর্গ বলিলেন, তাহাই হউক। দেবী কোথায় আসিলেন? যাঁহার সহিত উদ্বাহযোগে আবদ্ধ, তাঁহাকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে আরাধিত হইবার জন্য আসিলেন। কৈলাস কি? স্বর্গ। সেখানে বাস করেন দেব দেবীতে; দেবী দেবেতে। দেব যিনি, তিনিই দেবী; অবিভক্ত নিত্যকালের একেশ্বরী। স্বর্গে যিনি এক, পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন হইলেন। চৈত্র মাসে গৃহস্থের বাড়ীতে কে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে চায়?

যেখানে সাংসারিক সম্বন্ধ আছে, মায়া মমতা আছে, সেখানে সন্ন্যাসীর রাজাকে কে অভ্যর্থনা করে? সন্ন্যাসী যদি গৃহস্থের বাড়ীতে ঢোকেন, যেমন দুর্গার আগমনে শঙ্খধ্বনি হয় সেরূপ হইবে না। কি হ'বে? শঙ্খধ্বনির পরিবর্ত্তে সন্তানদিগের ক্রন্দনধ্বনি। মহাদেব যদি আগমন করেন, মহাদেবকে দ্বারের ভিতরে এক পা, দ্বারের বাহিরে আর এক পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; কেহ ঘরে ডাকে না। কুলবালারা তাঁহাকে আদর করিতে পারেন না। যিনি ধ্যানে অচেতনপ্রায়; যাঁর চক্ষু যোগেতে ঢুলু ঢুলু; বৈরাগ্য যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, সে লোককে গৃহস্থের পরিবার কিরূপে আদর করিবে? তাই বঙ্গদেশ বলিল, "মা দুর্গে, তুমি এস; সন্তান সহিত এস।" সেই দেবীর নিকট ক্রন্দন করিল, নিবেদন করিল। দেবী তথাস্তু বলিয়া অবতীর্ণ হইলেন। কুশলবিহীন অশান্ত নিরানন্দ বঙ্গদেশ শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ এবং সমুজ্জ্বলিত হইল। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর ক্রন্দন থামিল। মহাদেবের অর্দ্ধভাব হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল। শোন। রহস্য আরও শোন। জগতে তাঁহার আবির্ভাব কিরূপ? পৃথিবীতে থাকেন পার্ব্বতী, কৈলাসে থাকেন স্বামী। কিন্তু সতীরপ্রাণ সদা সেখানে যেখানে স্বামী অর্দ্ধাঙ্গ; শরীর কেবল পিত্রালয়ে। সতী যখন পিত্রালয়ে যান, তাঁহার শরীর সেখানে যায়, প্রাণ স্বামীর নিকটে পড়িয়া থাকে

আমরা ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া যে দুর্গার পূজা করি, সে কোন দুর্গা? সে কি কল্পনার দুর্গা? না। প্রকৃতিপূজাই প্রকৃত দুর্গাপূজা। মহেশ্বরের শক্তিপ্রকাশ পূজা। ব্রহ্মকে পর্ব্বতবাসী নির্জ্জনসন্ন্যাসী পূজা করেন। শক্তির আরাধনা সর্ব্বত্র দেখা যায়। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে প্রকাশবান্। হে ঈশ্বর, তোমার প্রকৃতি কোথায়? পর্ব্বতে, নদীতে, বৃক্ষে, গৃহের সকল বস্তুতে। হে ঈশ্বর, তোমার প্রকৃতি কোথায়? আমার ভিতরে, মনোমধ্যে, আমার বাহিরে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। প্রকৃতি ব্রহ্মেতে অব্যক্ত ছিলেন, সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইলেন। জগতে প্রকৃতির আবির্ভাব, জগতেই প্রকৃতির আরাধনা। পূজা হয় স্বর্গে, না পৃথিবীতে? বিশ্বেশ্বরের শক্তি কোথায়? কেন, পৃথিবীতে। মহিমা কোথায়? কেন, পৃথিবীতে। বাসস্থান কোথায়? কেন, পৃথিবীতে। বাসস্থান পৃথিবীতে অতএব পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা শক্তির আরাধনা করিতে পারি। মহেশ্বরের শক্তি উদ্যানে, আকাশে, গ্রহতারানক্ষত্রমধ্যে। বিশ্বপিতার শক্তি, বিশ্বমাতার শক্তি বিশ্বেতে, সৃষ্টিতে, সমুদয় জগতে। অতএব এখানেই ব্রহ্মপ্রকৃতির পূজা করিবে। যিনি স্বর্গে, তাঁহার শক্তি জগতে, অতএব গৃহমধ্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। হিমালয়ে তাঁহার সঙ্গে যোগ সাধন কর; আবার সংসারে, সৃষ্টিমধ্যে তাঁহার শক্তি ও মহিমা পূজা কর। জগন্মধ্যে তিনি সর্ব্বদা অর্চ্চনীয়া।

কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে কেবল তিন রাত্রি জগতে অধিষ্ঠান করিতে দেয়। বঙ্গদেশে ঘোষের বাড়ী মিত্রের বাড়ীতে যে পূজা হয়, তাহা অল্পকালস্থায়ী। তিন দিন পূজা করিয়া বঙ্গবাসী বলিল, আমি তিন রাত্রি দিলাম, ঈশ্বরকে চতুর্থ রাত্রি আর দিতে পারি না। আমরা অধিক কাল কাহাকেও গৃহে রাখিতে পারি না। সংসারের ধন মানকে রাখিতে পারিই না, ভালকে রাখিতে চেষ্টা করিয়াও রাখিতে পারি না! দেবীপূজা দেবীর আরাধনা অনেক হইল আর পারা যায় না; তিন দিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়াছে, মন দুর্ব্বল হইয়া হৃদয় রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ ভগবতী মাকে বিদায় করিয়া দিতেই হইবে। মা কি ছেলের নিকট বিদায় লইতে পারেন? যিনি জননীরূপে প্রকাশিত হইলেন, তিনি কি আবার চলিয়া যান? সন্তানকে ছাড়িয়া মা কি অন্যত্র গমন করেন? সকল মায়া মমতা কাটাইয়া যদি তিনি চলিয়া যান, তাহা হইলে সন্তানের কি হইবে? মাতৃবিচ্ছেদে কে সন্তান পালন করিবে? সন্তান ছাড়িয়া মা যাইতে পারেন না, আমরাও যদি ইচ্ছা করি মাকে ছাড়িতে পারি না। তিনি কদাপি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, করিতে পারেন না। সতীত্ব প্রেমশক্তি সমুদয় ব্রহ্মের ভিতর; সে সকল আবার পৃথিবীতে। তোমার বাটিতে, হে বঙ্গবাসী, তুমি কি দুর্গাপূজার দশমী করিতে চাও? নববিধান বলেন, ব্রহ্মপূজায় কেব-

লই সপ্তমী, কেবলই অষ্টমী, কেবলই নবমী, দশমী আর নাই।

পিত্রালয়ের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। বিশ্ব ছাড়া বিশ্বমাতা, বিশ্ব ছাড়া বিশ্বপিতা থাকিতে পারেন না, হইতে পারেন না। শক্তি ছাড়া অগ্নি, শক্তি ছাড়া জল, শক্তি ছাড়া স্ত্রী পুত্র পরিবার কল্পনা কর, কল্পনা হইল না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইংলণ্ড হইতে চীৎকার করিয়া বলিবে, শক্তি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে না। শক্তিই বিশ্বের প্রাণ। সে শক্তি যদি যায়, যেমন ভগবতী পৃথিবী ছাড়িয়া কৈলাসাভিমুখে চলিয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ গৃহ বাড়ী ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ধ্বংস হইবে। শক্তি ছাড়া জগৎ ভাবা যায় না। মা ছাড়া সন্তান! এ নিষ্ঠুর কল্পনার ছবি আঁকিও না। স্বদেশবাসী, তোমরা ক্রন্দন কর, আমরা ক্রন্দন করিব না। আমরা যে পূজা করি, তাহাতে দশমী নাই। আমাদের যে প্রতিমা, তাহা সৃষ্টির মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রের মুখে, পৃথিবীতে, আকাশে, জলে স্থলে সর্ব্বত্র প্রকাশিত। কিছুতেই যে এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ছবি মুছিয়া ফেলা যায় না। আমরা কি অনুমান দ্বারা এই দেবীকে আঁকিয়াছি? না, ইনি অনুমানের দেবী নন। আমাদের সত্য দেবীকে সদ্রূপে উজ্জ্বলরূপে দশ দিকে দেখিতেছি। খুব চক্ষুকে মার্জ্জনা কর, পরিষ্কার কর, সত্য

কি অনুমান পরীক্ষা দ্বারা এখনি বুঝিবে। আমাদের দেবী ত কিছুতেই অন্তরিত হন না। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে ছোট প্রতিমা, স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে বড় প্রতিমা। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আমাদের সেই দেবীর প্রকাশ, আবার প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ডতর তাঁহার প্রকাশ। এই নিরাকারা দেবীকে পূজা কর, হে বঙ্গদেশ। পরাৎপর পরব্রহ্মের মধ্যে তাঁহার যে প্রকৃতি আছে, সেই চিন্ময়ী সেই শক্তিরূপিণী দুর্গতি-বিনাশিনী দেবীর পূজা আরম্ভ কর, এবং চিরস্থায়ী আনন্দে দেশকে পরিপূর্ণ কর।

হে প্রেমসিন্ধু, হে মহাদেব, আমরা ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করি না। হে মহেশ্বর, হে সাধকের ধন, তোমার কোমল প্রকৃতি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত কর। তুমি মহেশ্বরীরূপে দর্শন দাও। তিন রাত্রির পূজার নিয়ম আমাদিগের নাই। পাঁচ বৎসর পাঁচ শতাব্দী পূজা করি-লেও তোমার পূজার নিবৃত্তি হয় না। তোমাকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তোমাকে বিদায় দেওয়া? এরূপ নিদারুণ বাক্য আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমরা তোমাকে যাইতে দিতে পারি না। যাইতে দিব না, যাইতে দিব না। এবার মহেশ্বরী পূজার অত্যন্ত ধূমধাম। কে তোমাকে এবার যাইতে দিবে? মহেশ্বরীরূপে, মাতঃ, চির প্রকাশিত থাক; পার্ব্বতীমূর্ত্তি ধরিয়া ভক্তের চিত্তরঞ্জন কর। দুইয়েতেই আমরা আছি। আমরা নববিধানবাদী, যোগেতে

আছি, ভক্তিতেও আছি। হে মহাদেব, তুমি এসেছ? তবে বস, বাঘছালের উপর বস। মা এসেছ? মা দুর্গে, বস। আমরা দুঃখী বঙ্গবাসী, আমাদিগের প্রাণ কেমন করিয়া তিন দিনের পর তোমাকে বিদায় করিয়া দিবে? গৃহস্থের বাড়ী ছাড়িয়া যাইলে বাড়ী যে তোমার জন্য ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হইবে। ছেলেদের সকলকে ফেলে তুমি কি, মা, সত্য সত্যই চলিয়া যাইবে? তুমি যে মা, তুমি যে মহেশ্বরী। মাকে মা বলিয়া, তিন দিন মাত্র ডাকিয়া ত সুখ হয় না, তুমি ত তাহা জান। মানুষ কি এত উন্নত হইল যে, তিন রাত্রির পর আর তোমাকে প্রয়োজন নাই? কোন হিন্দু কি এমন আছে, যে তিন রাত্রিতেই তাহার সুখের শেষ হইল? মা, একথা ঠিক নয়। তিন দিবসের ভজন সাধনে সুখ হইল না, দয়াময়, আর তিন দিবস। তিন দিনে হইল না; আর তিন দিন। হিন্দুকে এ কথা বলিতে হইবে। কাল যখন অসার মৃণ্ময় প্রতিমা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে, তখন সবাই কাঁদিবে। মা, আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আবার ফুল দিয়ে পূজা করি। আবার নামিয়া আয় মা, আমরা আবার নৈবেদ্য সাজাই, আবার সপরিবারে সবান্ধবে আমোদ করি। বঙ্গদেশকে অন্ধকার করিয়া কোথায় যাস্? "ওরে তোরা নিয়ে যাস্‌নে, আমার সোণার মাকে তোরা নিয়ে যাস্‌নে।" কোন্ সরলহৃদয় বাল্যস্বভাব হিন্দু না এইরূপ বলিবে? এরূপ বলা স্বাভাবিক।

প্রতিমা যদি জাগ্রৎ সৎ হইত, তাহা হইলে সকলেই উহাকে ধরিতে যাইত। প্রতিমা ত শুনে না, ফেরে না। বঙ্গদেশ কাঁদিল, আহা কেহ শুনিল না। নিষ্ঠুর মাটির দেবতা সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। নিত্যানন্দদায়িনী মা, আমরা তোমাকে অনন্তকাল পূজা করিব। আমরা কি বলিতে পারি, তুমি যাও? আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মের প্রকৃতি, ব্রহ্মের প্রকৃতিতে ব্রহ্মকে দর্শন করি। আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মসন্তানগণকেও প্রাপ্ত হই। আমাদের বিচ্ছেদের ভয় নাই। মা আনন্দময়ি নিস্তারিণি, আমরা তোমার কাছে বসিয়াছি। এই স্থানেই কৈলাস। যেখানে মহেশ্বর ও তাঁহার প্রকৃতি মহাদেবী সেই কৈলাস। এখানে কেবলই সপ্তমী। দশমী যে ব্রাহ্মসমাজে হয়, কি হইতে পারে, একথা আমরা মানি না। আজ তাই ভাই ভগিনীদের জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সমুদয় বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়া দাও, দুর্গা কে? দুর্গা কি? দুর্গা কোথায়? মা-ধন যিনি, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। মা দয়াময়ি, আমরা যেন বলি, ভ্রান্ত বঙ্গবাসীভাই, মার কাছে আয়, মার কাছে আয়, মার হাত ধর, মার পায়ে পড়; ও পথ ছাড়, এ পথ ধর; নিত্যানন্দের পথ ধর। হে মঙ্গলময়ী জননি, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এমন ভাবে যেন জীবন কাটাইতে পারি, যাহাতে দেশে চিন্ময়ী নিরাকার সত্য দেবীর পূজা প্রতি-

ষ্টিত হয়। মা দয়াময়ি, দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

যিনি ব্রহ্ম তিনি হরি।

রবিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৮০৩ শক।

বেদ এবং পুরাণে এত প্রভেদ যে মনে হয়, বেদের ঈশ্বর ভিন্ন এবং পুরাণের ঈশ্বর ভিন্ন। বেদের মধ্যে অবতার নাই, রাম নাই কৃষ্ণ নাই। পুরাণ কেবল অবতারদিগের লীলা লইয়াই ব্যস্ত। যখন বেদের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্মের কিছু মাত্র পূর্ব্বাভাস তাহাতে দেখিতে পাই না। যখন পুরাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হই, তখন ঋষিদিগের আরাধিত পরাৎপর পরব্রহ্মকে পাওয়া যায় না; ব্রহ্ম পদার্থকে দেখা যায় না। প্রাচীন কালের আর্য্যধর্ম্ম ব্রহ্মকে লইয়া বসিয়া রহিলেন, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। আধুনিক ধর্ম্ম বিষ্ণুর বিবিধ অবতারের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্ম ও আধুনিক হরি, ভারতকে যেন দুই পথ দেখাইয়া দিলেন। এক জন বনের দিকে, পর্ব্বতের দিকে, নির্জ্জন নদীতটে, বিজন গহনে, গিরিগহ্বরে। আর এক জন তীর্থস্থানে, ভক্তমণ্ডলীতে, শ্রীবৃন্দাবনে, জগন্নাথক্ষেত্রে, সাধু ভক্ত পরিবার মধ্যে। ব্রহ্মকে লইয়া কেহ কেহ নির্জ্জনতা আশ্রয় করিলেন;

বিরলে তাঁহার সাধন ভজন করিয়া যোগীর পদ প্রাপ্ত হই-লেন। কেহ কেহ হরিলীলা শ্রবণ করিয়া ও শ্রবণ করাইয়া প্রেম ভক্তির সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেন। এই দুই পথ আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আমরা ব্রহ্ম ও হরি উভয়েরই পক্ষপাতী। ব্রহ্ম-ধন আমাদিগের ধন; হরি-ধনও আমাদিগের ধন। ব্রহ্মকে আমরা মিষ্ট বলি, ব্রহ্মের ন্যায় মিষ্ট আর কিছুই নাই। হরি অপেক্ষাও কিছুই মিষ্টতর নাই। ব্রহ্মের ন্যায় ঈশ্বর পাওয়া যায় না; হরির ন্যায় দেবতা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে না। ব্রহ্ম অপেক্ষা বড় কেহই নহে; হরি অপেক্ষা সকলেই ছোট। ব্রহ্মনাম শুনিলে যোগীর আত্মা উড়িতে যায়, হরি নাম শুনিলে ভক্তের হৃদয় নাচে। ব্রহ্ম বড় না হরি বড়? কেহ কেহ ব্রহ্মকে বড় বলিলেন; কেহ কেহ হরিকে বড় বলিলেন। নব-বিধান বলেন, হরি যিনি ব্রহ্মও তিনি। বেদের ঈশ্বর আর পুরাণের ঈশ্বর ভিন্ন নয়। বৈদিক যোগীরা যাঁহাকে আকাশে মহাকাশে স্থির ভাবে বিরাজিত দর্শন করিলেন, পৌরাণিক ভক্তেরা তাঁহাকেই সংসারের নিম্ন ভূমিতে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ঋষিরা যাঁহাকে নিমীলিত নয়নে যোগধ্যানে অনুভব করিলেন, ভক্তেরা মৃদঙ্গ করতালি বাজাইয়া, নৃত্য করিয়া আনন্দে আনন্দিত হইয়া হরিপদারবিন্দ পূজা করিলেন; তাঁহার পদ-তলে পড়িয়া সুখী হইলেন। ঋষির ব্রহ্ম ও ভক্তের হরি,

দুইয়ের মধ্যে কাহাকে বড় করিব? বড় করিব কি! দুই সমান। যদি নববিধানে প্রাণের কাঁটা স্থির হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্ম ও হরির সন্ধিস্থল আমরা পাইয়াছি। ব্রহ্ম এবং হরিকে আমরা এক করিয়াছি। আমরা এক করিয়াছি কেন বলিলাম? একই ছিল। দৃষ্টিভেদে ও সাধনভেদে বেদ এবং পুরাণের ভেদ হইয়াছিল। সাধন যখন অভেদ হইল, জ্ঞান যখন অভেদ হইল, বুদ্ধি যখন অভেদ হইল, তখন আর বেদ পুরাণে প্রভেদ রহিল না। ব্রহ্মের ভিতর আমাদের হরি, হরির ভিতর আমাদের প্রাণের সহিত ব্রহ্ম। আমরা যে বলি, "হরিঃ ওঁ"। ওঁকারের সহিত আমাদের "হরি" সংযুক্ত। মনোমোহন হরিকে "হরি ওঁ" বলিয়া আমরা পুলকসাগরে মগ্ন হই। আমরা বলি যেই হরি সেই ব্রহ্ম, যেই ব্রহ্ম সেই হরি। ব্রহ্মের ভিতর হরিদর্শন। এ কথা কি মিথ্যা? মিথ্যা হইলে পবিত্রবেদী হইতে কি একথা বলিতাম, যখন ঈশ্বর উদ্ধার করেন, তখন তিনি হরি; যখন বিবিধ ভাবের মধ্যে খেলা করেন তখন হরি। আবার সেই হরি দেবদেব মহাদেব চিরমৌনী, বাক্যবিহীন, কর্ম্ম-বিহীন, আকাশস্থিত, অচল, অটল, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম। যদি কবি হইতাম, তবে কল্পনা সহকারে ভাল করিয়া বর্ণনা করিতাম; যদি চিত্রকর হইতাম, তবে ইহা চিত্র করিতাম। কিরূপে? একদিকে নিস্তব্ধ মহান্ আকাশের দেবতা বর্ত্ত-মান, আর এক দিকে লীলাকর্ত্তা দয়াময় করুণাময় সুরসে

রসিক হইয়া জগতের পাবন হইয়া পাপী উদ্ধার করিতেছেন। আমরা ত অবতার হরিকে মানি না। দেহধারী, রূপধারী, চঞ্চলস্বভাব, মানবচরিত্র বিশিষ্ট হরিকে আমরা ত মানি না, পূজা করি না। কিন্তু যথার্থ হরিকে মানি; যিনি "হরিঃ ওঁ" তাঁহাকে মানি। যখন সপ্তস্বর মিলাইয়া "হরিঃ ওঁ" বলি, তখন যে হরিকে বর্ত্তমান দেখি তিনি ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বদেবময়, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে, তিনি বেদান্তে। যিনি ঋষির ভ্রূর মধ্যে তিনিই ভক্তের বক্ষের ভিতর। যিনি যোগীর নিমীলিত নয়নে, তিনিই ভক্তের উন্মুক্ত চক্ষে। যাঁহাকে যোগী নয়ন বন্ধ করিয়া দর্শন করেন, ভক্ত তাঁহাকে উন্মীলিত নয়নে দেখিয়া নৃত্য করেন। তবে যদি বল, হরি এদেশে সাকাররূপে ভগবদ্ভক্তদিগের দ্বারা অর্চ্চিত ও আরাধিত হইয়াছেন, তবে শ্রবণ কর, হিন্দুস্থান, শ্রবণ কর। প্রণবস্বরূপ ওঁকারের মধ্যে এ দেশে হরি ছিলেন। তুমি প্রাচীন হরিকে বিসর্জ্জন করিয়া আধুনিক হরিকে কেন লও? কেবল যোগচক্ষে ভক্তিচক্ষেই হরিদর্শন হয়। চর্ম্ম-চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না। হরি অত্যন্ত প্রাচীন আর্য্য-জাতির কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের পর-মারাধ্য হইয়াছেন। বৈষ্ণবের চরণে আমাদের নমস্কার; ঋষির চরণেও কোটি কোটি নমস্কার। যাঁহারা হরির কথা বলেন, তাঁহাদিগকেই আমরা আদর করি, সম্মান করি; প্রভুর দাস বলিয়া মান্য করি। ঋষি ও ভক্ত, যোগী ও

বৈষ্ণব, উভয়েরই কাছে গিয়া বলি, পদধূলি দাও। যে দিন দুইয়ের পদধূলি মিশ্রিত হইবে, সেই দিন ভারতের পরিত্রাণ। যদি বৈষ্ণবের হরিকে ছাড়িয়া কেবল বেদান্তের ব্রহ্মকে লও, তবে অনেক অনিষ্ট হইবে; সকলে শুষ্কহৃদয় হইয়া পড়িবে। এখানকার হরিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক ব্রহ্মযোগকে একত্র মিলিত কর। যোগভক্তির যখন সম্মিলন হইল, হরি ব্রহ্ম যখন অভেদ হইলেন, তখন বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যের দিন উদিত, ভারতবাসীর সুখের দিন নিকটস্থ হইল। তখন বলিব ব্রহ্মমন্দিরসংস্থাপন সফল হইল; নববিধান পূর্ণ হইল। ব্রহ্মই হরি, তিনিই মা, লীলাকর্ত্তা ও লীলাকর্ত্রী। আমরা যে বেদান্তের ব্রহ্মকেই হরি বলি। নতুবা ওঁকারের সঙ্গে হরি কেন? ওঁ যে ব্রহ্মনাম; সাধনের উৎকৃষ্টতম শব্দ ওঁ যে বেদের শ্রেষ্ঠ অক্ষর, ওঁ যে ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব; ওঁ যে হিন্দুস্থানের মাথার মাণিক। ওঁ শব্দের ন্যায় আর শব্দ নাই। ওঁ শব্দের ভিতরে যেমন নিরাকার ভূমা ব্রহ্ম, এমন আর কোন শব্দে নাই। প্রথম অক্ষর ওঙ্কার ব্রহ্ম এবং হরি একই। যখনই ওঁকার সহকারে বলি, হরি হরি হরি হরি, তখন সেই নির্ম্মল নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। সেই সৎস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মকে হরি বলি কেন? হরি বলিলে সুখ হয়। এই যে হরি নামটি, ইহাতে গুড় মিছরি সুধা যত প্রকার মিষ্ট রস আছে, সমুদয় একত্র মিশ্রিত। হরিনাম শুনিয়া ভক্তেরা মোহিত হইয়া

মূর্চ্ছিত হন; হরিনাম শুনিবামাত্র কত ভক্তের দশাপ্রাপ্তি হয়। হরিনাম যেন সুধাপূর্ণ সোণার কলস। হরিনাম কাণে প্রবেশ করিবা মাত্র মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শীতল হইয়া যায়। বৈশাখমাসে শীতল জলে অবগাহন করিলে যেমন সুখ হয়, ঠিক সেইরূপ সুখানুভব হয়। হরিনামসলিলে অবগাহন করা অত্যুক্তি নহে। হরিনামে এমনই মজা! হরিনাম এমনই সরস! ঐ যে অক্ষর দুইটি, ঐ যে শব্দটি উহা প্রেমামৃতে থই থই করিতেছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নিমগ্ন হও, প্রাণ শীতল হইবে, ঠিক যেন স্নান করিয়া উঠিবে। আমরা কি এমনই আত্মপ্রবঞ্চিত, আমরা কি এমনই মূর্খ যে, পিতা প্রপিতামহ পিতামহ যে হরি নামকে আদর করিয়াছিলেন, আমরা সেই হরিনামকে ছাড়িয়া দিব? প্রপিতামহের বহুপূর্ব্বে ঋষিরা প্রণবস্বরূপ ওঙ্কারের সহিত হরির আরাধনা করিতেন। হরিনাম ভারতের পুরাতন মধু। পুরাতন মধু মিষ্টতম মধু। ইহা কি আমরা ছাড়িতে পারি? এ মধু ছাড়িলে নববিধান চলে না, উপাসনা শুষ্ক হয়। হরিনামে কি বিরক্ত হওয়া যায়? হরিনামবিহীন ধর্ম্ম, নীরস ধর্ম্ম। সুখসরোবর ফেলিয়া বালুকারাশির উপর বসিয়া তুমি কি ধ্যান করিতে যাইবে? হরি যে রস পান করাইয়াছেন, আমরা তাহাতে কখনই হরিকে ছাড়িতে পারি না। হরিকে লইয়া যে কি করিব, ঠিক পাই না। ব্রহ্মের সময় একটা ঠিক ছিল। এ হরির সময় কিছুই ঠিক পাই না।

হাতে করি, বুকে ধরি, মুখে রাখি, মাথায় রাখি, তথাপি কি যে করিব ঠিক পাই না। দিন নাই, ক্ষণ নাই, মাস নাই, বৎসর নাই, উৎসবের পর উৎসব, তার উপর মহোৎসব হইল, হরিকে লইয়া তবু আবার যে কি করিব, তাহার ঠিক পাই না। ভবিষ্যৎ তাহা জানে, বর্ত্তমান তাহা বলিতে পারে না। হরি নাম করিতেছি বলিয়া যে কত সুখ হই-তেছে, দশ বৎসর চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিলেও সে সুখের বর্ণনা শেষ হয় না। কেমন, আত্মা, তুমিত সাক্ষী। হরিনামে যে কত সুখ তাহার সাক্ষ্য দিতে হইবে। হে আত্মন্, সাক্ষ্য দাও। যখন বলি প্রেমময় হরি, তখন সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়, চক্ষু হইতে প্রেমের জল পতিত হয়। পৃথিবী আছে কি গিয়াছে, জানা যায় না। স্বর্গ কি আসিল নাকি, এই মনে হয়। হরিনামে যে কি হয়, তাহা হরি জানেন। হরিদাস জানে, হরিদাসী জানে, আর কেহই জানে না। এই এক শব্দে ভক্তের প্রাণ পাগল হইয়া যায়। যাই "হ" তার পর 'রি' ভক্তের মুখে উচ্চারিত হয়, মুখের পানে তাকাইয়া দেখি, তার শরীর গলিয়া গিয়াছে। মানুষ যে, নরাধম যে, সেও যেন প্রেমের পুতুল হইয়াছে। কি ছিল আর কি হইল? হরিকে পাইয়া কত সুখ! এক দিকে নিরাকার, আর এক দিকে প্রেমলীলা। এতকালের পর কাশী আর বৃন্দাবন এক তীর্থ হইল। যদি সাকারবাদী থাকিতাম, কাশীধামে যাইতাম যোগসাধন করিবার জন্য,

শ্রীবৃন্দাবনে যাইতাম প্রেম ভক্তি লাভের জন্য। কাশী-ধাম যোগধাম; বৃন্দাবন প্রেমধাম। এখন নববিধানবাসী হইয়া হৃদয়ের এক ভাগকে বলিয়াছি তুমি হও কাশী, অপর ভাগকে বলিয়াছি তুমি হও বৃন্দাবন। আমি যত কাল বাঁচিব, অন্তরে কাশী বৃন্দাবন এই তীর্থদ্বয় একত্র করিয়া রাখিব। এই নববিধানের মধুর ভাব কি তুমি গ্রহণ করিবে না? যোগ ভক্তির মিলন কি করিবে না? ইন্দ্রিয়সুখের বশীভূত হইলে, টাকাতে কত মোহ জানিলে, হে বিভ্রান্ত জীব, কিন্তু এ তত্ত্বসুধা পান করিলে না? হরি ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-হরি উনবিংশ শতাব্দীর যে এই মন্ত্র। পিতামহ বলিতেন, ব্রহ্ম ব্রহ্ম, পিতা বলিতেন হরি হরি, আমি বলিতেছি হরিব্রহ্ম ব্রহ্মহরি হরিব্রহ্ম ব্রহ্মহরি। আমি যোগাসনে বসি, যোগাসন হয় প্রেমাসন; প্রেমাসনে বসি, প্রেমাসন হয় যোগাসন। সন্ন্যাসী বৈষ্ণব এক হইয়া গেল। যে সন্ন্যাসী ছিল, সেই বৈষ্ণব হইল; যে বৈষ্ণব ছিল সেই সন্ন্যাসী হইল। ভক্ত যে ছিল সে হইল যোগী, যোগী ভক্ত হইল। আমরা অর্দ্ধেক সন্ন্যাসীর পথে, অর্দ্ধেক বৈষ্ণবের পথে; আমরা অর্দ্ধভাগ বেদান্ত সাধন করি, অপরার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত সাধন করি। আমার অঙ্গের এক দিকে লেখা ব্রহ্ম অপর দিকে লেখা হরি। এক চক্ষে ব্রহ্মতেজ, অপর চক্ষে হরি-প্রেম। মুখে একবার বলি ব্রহ্ম, আর একবার বলি হরি। এক কর্ণে শুনি যোগেশ্বরের নাম, পরব্রহ্মের নাম; অপর

কর্ণে শুনি প্রেমময়, দয়াময়, চিরসুন্দর হরির নাম। আমার দুই হস্তে দুই ধন। ব্রহ্মনাম এক হস্তে, হরিনাম অপর হস্তে, যদি এমন অবস্থা আমার হয়, আমার ন্যায় সুখী আর কে আছে? যোগের সাগর প্রেমের খনি আমার কাছে। হে নববিধানবাদী ব্রহ্মসাধক হরিকিঙ্কর, হরিনাম ব্রহ্মনাম লইয়া সুখী হও। হরি ব্রহ্ম হরি ব্রহ্ম বলিয়া সুখী হও। দিবানিশি হরিনাম কর। হরিনাম অপরকে শ্রবণ করাও। ব্রহ্মহরি হরিব্রহ্ম বলিতে বলিতে হরিরসাগরে ডুবিয়া যাও। সুখের পর সুখ তার পর সুখ হইবে। কত যে সুখ তাহা বলা যায় না। বল সকলে, হরিপদপ্রান্তে থাকে যেন এই কিঙ্করের মন! এই বিনীত নিবেদন।

তীর্থ-চতুষ্টয়।

রবিবার, ১লা কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক।

কোন বিচক্ষণ তত্ত্বপ্রিয় পরিব্রাজক চারি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তথায় কি কি দেখিলেন তদ্বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ কর। এই চারি তীর্থ পৃথিবীতে সর্ব্বাদৃত আশ্চর্য্য তীর্থ। ইহার প্রত্যেকটি দেখা আবশ্যক, নতুবা জ্ঞান ভক্তি চরিতার্থ হইবে না, ঘরে বসিয়া থাকিলে বিবিধ ভ্রান্তিতে ক্লেশ পাইতে হইবে, এই ভাবিয়া পরিব্রাজক স্থির করিলেন, সমুদয় নিজ চক্ষে দেখিব, নিজ কর্ণে শুনিব, বিবিধ তীর্থ সন্দ-

র্শন করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মের পন্থা অবধারণ করিব; ভ্রমণ দ্বারা ভগবানের কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করিলে হৃদয়ে পুণ্য শান্তি সঞ্চিত হইবে; তীর্থভ্রমণে নিশ্চয়ই মোক্ষফল লাভ হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না না করিয়া পরিব্রাজক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। প্রথমেই অতি নিকটবর্ত্তী দেহতীর্থ। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কেবলই কর্ম্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব। হস্ত পদ কর্ম্মে ব্যস্ত; চক্ষু কর্ণ কর্ম্মে ব্যস্ত। প্রাতঃকালে কর্ম্ম, মধ্যাহ্নে কর্ম্ম, অপরাহ্নে কর্ম্ম, রজনীতে কর্ম্ম। এই কর্ম্ম যে আবার কত প্রকার তাহা গণনা করা যায় না। হিন্দুর আচার ব্যবহার দেখিলেই জানা যায়, বাহ্যলক্ষণে মুসলমানকে চিনিতে পারা যায়, খ্রীষ্টবাদীকে সহজেই মুসলমান হইতে পৃথক করা যায়, বৌদ্ধকেও অন্য তিন সম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৈশেষিক লক্ষণ আছে। উহার দ্বারা এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায় হইতে প্রভেদ করা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে আপন আপন বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া সকলকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছে। দেহতীর্থে কেবলই ক্রিয়াকলাপ, কেবলই বিধি নিয়ম,কেবল কার্য্যের আড়ম্বর, দেহতীর্থ কেবলই বলিতেছে, আইস, আমার নিকটে আইস। মোক্ষধামে যদি যাইবে, এইরূপে ব্রতাদি গ্রহণ কর, এইরূপে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। এই গৃহধর্ম্ম, এই বনবাসীর ধর্ম্ম, এই ব্রহ্মচারীর লক্ষণ, এই

নির্ব্বাণের লক্ষণ। এইরূপে হোম করিতে হয়, এইরূপে জলাভিষেক করিতে হয়। এই এই মন্ত্র উচ্চারণ করা আবশ্যক, এইরূপে শরীরকে নিগ্রহ করা উচিত; এই প্রণালীতে ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়। সকলেরই বিভিন্ন লক্ষণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার। এ সকলই মায়া। দেহ যদি মায়া হইল, অসার হইল, তবে যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড কেবল মায়ার খেলা। তন্মধ্যে শান্তি কুশল নাই। চারি দিকে পরিব্রাজককে লইয়া টানাটানি। কর্ম্মকাণ্ডের ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে তিনি প্রাণরক্ষায় অসমর্থ; স্থির হইয়া বিবেচনা করিবেন কিরূপে? কোন্ কর্ম্মে ধাবিত হইবেন, কোন্ ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাহা নিয়ম করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। এত কর্ম্ম! শরীরটা কলের মত এক বার এ দিক এক বার ওদিক ঘুরিতেছে। এ তীর্থে কেবল কর্ম্মের উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে। আত্মার কল্যাণ নির্ভর করিতেছে সাত্ত্বিক আহারের উপর, কিংবা বৈরাগ্য বস্ত্রের উপর। কেবল বাহ্য লক্ষণেই ধর্ম্ম স্থাপিত। হস্ত যদি এই কাজ করে, মানুষ বৈকুণ্ঠে চলিল; মুখ যদি এই শব্দ উচ্চারণ করে, তবেই তাহার পরিত্রাণ কর্ম্মকাণ্ডের ভিড়ে অবসন্ন হইয়া পথিক চলিলেন, দ্বিতীয় তীর্থে। দেহতীর্থের পার্শ্বেই মন তীর্থ। এখানে কোন প্রকার শারীরিক ভাব নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব তদ্রূপই। সেই ঈশাবাদী, সেই মহম্মদবাদী, সেই হিন্দু. সেই বৌদ্ধ, সেই শিখ। সমুদায়

সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলই কলহ বিবাদ, মতে মতে বিবাদ, গ্রন্থে গ্রন্থে বিরোধ। এখানে বুদ্ধি সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছে। দেহতীর্থে হাত যেমন, এখানে বুদ্ধি তেমনই সর্ব্বপ্রধান। বুদ্ধি কত মত উদ্ভাবন করিতেছে, কত মত প্রচার করিতেছে। এখানে রাশি রাশি পুস্তক; রাশি রাশি সিদ্ধান্ত। নানা সম্প্রদায়ের নানা শাস্ত্র। এ সম্প্রদায়ের বেদ ও সম্প্রদায়ের কোরাণ। যেমন কলহ বিবাদ প্রথম তীর্থে, তেমনি কলহ বিবাদ দ্বিতীয় তীর্থে। এই মন তীর্থের ভিতর কত বিবাদ! কার মত ভাল, কার মত মন্দ? ললিতবিস্তর মহৎ, কি বাইবেল মহৎ? কোরাণ বড়, কি বেদ বড়? কেবল এই সকল কথা লইয়া তুমুল সংগ্রাম। সমস্ত নিরাকার রাজ্য বটে, সাকার বাহাড়ম্বর কিছুই নাই; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ন্যূনতর নহে। দেহতীর্থে হস্তসঞ্চালন যেমন দেখা যাইত, এখানে তেমন নাই বটে, কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধির ঠিক সেইরূপ ব্যবহার হইতেছে। বুদ্ধি কেবল এক এক মত প্রচার করিতেছে, আর কতক গুলি মত খণ্ডন করিতেছে। পরিব্রাজক দেখিলেন, সকলেই আপনাপন ধর্ম্মে অপরকে টানিবার জন্য ব্যস্ত; আপনাপন মতে অপরকে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত। মতই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। এইটি মানিলে স্বর্গ, এটি না মানিলে নরক, কেবল এই যুক্তি। আমার মত ভাল, তোমার মতে দোষ আছে, আমার গ্রন্থ ভাল, তোমার গ্রন্থে ভুল আছে,

এইরূপ পরনিন্দা লইয়া সকলে ব্যস্ত। শত্রু যেমন বৈর-নির্য্যাতন করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, তেমনই এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বিনাশ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছে। এ তীর্থে কি মনুষ্য সুখী হইতে পারে? বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বলিতেছে, এখানে মিলনের সম্ভাবনা নাই। দেহতীর্থে যেমন সকলের হস্ত ভিন্ন ভিন্ন দিকে, এখানে সকলের বুদ্ধি তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরিতেছে। বুদ্ধিতে মঙ্গলের পথ মিলিল না; বিচারে কুশলের সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সেই তত্ত্বান্বেষী তৃতীয় তীর্থে প্রবেশ করিল। সেখানে কিছু কিছু কুশলের বাতাস বহিতেছে। সেটি হৃদয়তীর্থ। মন তীর্থের পার্শ্বেই ইহা অবস্থিত। এই তীর্থ অতি সুবিস্তৃত, এখানে সংকীর্ণতা নাই। দেহ মন যেমন সংকীর্ণ তীর্থ, ইহা সেরূপ নহে। এখানে প্রেম সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে, দেখিতে দেখিতে এখানকার উচ্চতর গভীরতর প্রেমের ব্যাপারের মধ্যে পরিব্রাজক প্রবেশ করিলেন। সেখানে আত্মপর যে নাই এমন নহে, আপনার ধর্ম্ম, অন্যের ধর্ম্ম, আপনার সম্প্রদায়, অন্যের সম্প্রদায়, এরূপ প্রভেদ আছে। স্বজাতীয়, বিজাতীয়ের ভিন্নতা সেখানেও আছে। কিন্তু প্রেম সেই দেশের রাজা। তিনি এমন সুব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সহস্র প্রকার মতভেদ থাকিলেও এক জন অপরকে ভালবাসিতে

পারে। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়স্থ লোকের সেবা করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকে। এক দেশের লোক দয়ার্দ্র হইয়া অপর দেশীয় ব্যক্তির দুঃখ মোচন করে। দেশভেদে জাতিভেদে প্রণয়ের ব্যাঘাত হয় না। মতসম্বন্ধে যে যত দূরস্থ ও বিরোধী হউক না কেন হৃদয়ের পক্ষে সকলেই ভ্রাতা ও ভগিনী। প্রেমের এইরূপ মিলন-বিধি। ধর্ম্ম কেবল এ রাজ্যে ভালবাসা। পরম পিতাকে ভালবাসা, এবং ভ্রাতাকে ভালবাসা। চারি দিকে নানা সম্প্রদায়। তাহাদের বিবাদবিসংবাদসত্ত্বেও হৃদয় এমনই কোমল যে, উহা স্বভাবতঃ সকলকে ভাই বলিয়া ডাকিতেছে। হিন্দু যিনি, তিনি ক্রিয়া কর্ম্মে মুসলমান প্রভৃতিকে বিজাতীয় মনে করেন, বিধর্ম্মী জ্ঞান করেন। কিন্তু যাই তিনি উচ্চ ছাদের উপর দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন, বিভিন্ন মত ও ক্রিয়া সকল অবলোকন করিলেন, অমনি তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত হইল, সর্ব্ব জীবে প্রেম ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "হইলই বা বিরোধী, হইলই বা ভিন্ন সম্প্রদায়; সকলকে ভাই বলিয়া, ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিব, ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে দয়া করিব। কেবল হিন্দুকে কেন? যবনকে মুসলমানকেও আলিঙ্গন করিব। কেন না ঈশ্বরের দ্বারে উচ্চ নীচ নাই।" বুদ্ধি বলে উচ্চ নীচ আছে, কর্ম্মকাণ্ড বলে লোক মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধের প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রেম

উথলিল, হৃদয়তীর্থ প্রেমে ভাসিল, তখন প্রভেদসেতু উল-ঙ্ঘন করিয়া শান্তি জল বিস্তৃত হইল। তর্ক কর, বিচার কর, কর্ম্মকাণ্ড লইয়া; আপনার মত ঠিক রাখ, অপরের বিরুদ্ধ-মতের প্রতিবাদ কর, কিন্তু আবার ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল বাস, হৃদয়তীর্থে কেবলই ভাল বাস। পথিক ভাবি-লেন এ কোথায় আসিলাম? এই দেখিলাম, বুদ্ধি শাস্ত্র লইয়া ঘোরতর বিচার করিতেছে, ভয়ানক বিবাদ চলিতেছে, এ আবার কোথায় আসিয়া পড়িলাম? এত দলাদলির ভিতরেও প্রেম! যে যেরূপ বিচার করে করুক, যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে চায় করুক, কিন্তু মার সন্তান হইলেই ভাই, এখানে কেবল এই যুক্তি। ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল বাসাই এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। প্রেমের সুশীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে পরিব্রাজক অবশেষে চতুর্থ তীর্থে প্রবেশ করিলেন। এটির নাম আত্মা তীর্থ। এখানে কেবল সুশীতল সমীরণ নয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট পুষ্পসৌরভ হৃদয় মন প্রাণকে আমোদিত করিতেছে। তী-র্থভ্রমণের ক্লেশ দূর হইবে, এই আশা করিয়া তিনি আত্মা তীর্থে শান্ত ভাবে একটি মনোহর বিজন স্থানে বসিলেন। দেহরাজ্যে কর্ম্মের গোলমাল; এখান হইতে তাহা বহু দূরে। মন তীর্থে বুদ্ধির আন্দোলন এবং বহু বিচার ও বিবাদ। সেখানকার শব্দ দূরতা বশতঃ এখান হইতে অতি অল্প শোনা যায়, বিবাদ বিসংবাদ রহিত যে হৃদয়তীর্থ,

যেখানে কেবলই প্রেম, তাহাও নিতান্ত নিম্নে। এখানে তীর্থবাসীদিগের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যাঁহারা এখানে বাস করিব বলিয়া স্থিরসংকল্প হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সেই প্রাচীন কথা নূতন অর্থ ধারণ করিয়াছে। কোন্ প্রাচীন কথা? মায়া। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন এ জগতে সকলই মায়া। অন্ন মায়া, জল মায়া, বায়ু মায়া, ধনসম্পত্তি সকলই মায়া, এই পর্য্যন্ত বলিয়া মায়াবাদীরা নিরস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু মায়ার রাজ্য আরও বিস্তৃত। সংসার ত মায়া, জল অগ্নিত মায়া, ঈশা মুষার যে প্রভেদ তাহাও মায়া; শ্রীগৌরাঙ্গ ও গৌতম, কবির ও নানকের যে প্রভেদ তাহাও মায়া। এক জন ধনী, এক জন দরিদ্র, এ সব কল্পনা। কেহ ধনী নহে, কেহ দরিদ্র নহে। ইহার লক্ষ টাকা আছে, ইহার এক পয়সা আছে, ইহাও মায়ার খেলা। লক্ষ টাকা আন, জ্ঞানীরা উহাকে তৃণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিবেন। যাহাকে রজ্জু মনে কর, তাহা সর্প হইতে পারে, যাহাকে সর্প বল, তাহা রজ্জু হইতে পারে। যাহাকে বলিতেছ টাকা, তাহা মাটি হইতে পারে, যাহাকে মাটি বলিতেছ, তাহা টাকা হইতে পারে। পৃথিবীতে রাজপ্রাসাদে বাস, ধনীর ঐশ্বর্য্য, সকলই মায়ার কথা। বৃক্ষতলে যে বসিয়া থাকে আর রাজপ্রাসাদে যে বাস করে, দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা মায়ায় ব্যাপার। যে বৃক্ষতলে থাকে, সে সুখী হইতে পারে, যে রাজপ্রাসাদে বাস

করে, সে হয় ত দুঃখের আগুনে জ্বলিতেছে। তবে এই যে ধনশীলতা ও দারিদ্র্য, ধনাঢ্য হওয়া ও পথের কাঙ্গালী ও ভিখারী হওয়া, এ কেবল মায়া। সুশোভন শরীর সোণার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এ সব মায়ার খেলা। এই আছে, এই নাই। ধন মান এই আছে, এই নাই। এই সকল যদি মায়া হইল, তবে হিন্দু মুসলমানে, শাক্ত বৈষ্ণবে, দণ্ডী গৃহীতে যে প্রভেদ, তাহাও মায়া না হইবে কেন? কেন আর বল, বেদবাদী; পুরাণবাদী; বিষ্ণুবাদী; শক্তিবাদী; ইনি শক্তির উপাসক, উনি ভক্তির উপাসক। যিনি ঈশা, তিনি মুষা; অভেদশাস্ত্র শ্রবণ কর। ক্রিয়াতে হিন্দু, হিন্দু, ক্রিয়াতে যবন, যবন। হিন্দু মুসলমানে, খ্রীষ্টবাদী ও মহম্মদবাদীতে অনেক মতভেদ, মনে হয় কিছুতে মিল হইবে না। যত ক্ষণ চক্ষু কর্ণ দেখিবে, শুনিবে, কর্ম্মকাণ্ড লইয়া থাকিবে, হস্ত পদ ধরিবে ও চলিবে, তত ক্ষণ প্রভেদ থাকিবেই থাকিবে। উপরে উঠ, দ্বিতীয় তলে বুদ্ধির ঘরে যাও, তখনও ভেদাভেদ জ্ঞান। যত ক্ষণ বুদ্ধির তর্ক ও বিচার আছে, তত ক্ষণ ভেদ জ্ঞান যাইবে না। তৃতীয় তলে উঠ; সেখানে ঐ কোলাহল ক্রমে শান্ত হইতেছে। চতুর্থ তলে উঠ, সেখানে সকলই নিস্তব্ধ, কেবল অভেদজ্ঞান। যে হিন্দু, সেই খ্রীষ্টবাদী; যে কৃষ্ণ ধর্ম্ম, সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম; যে শঙ্করাচার্য্য, সেই যাজ্ঞবল্ক্য; যে বেদ, সেই পুরাণ; যে পূর্ব্ব, সেই পশ্চিম; যে স্বদেশী লোক, সেই বিদেশী লোক; যে

বিদেশী, সেই স্বদেশী। কর্ম্মকাণ্ডে ভিন্নতা। তাই এ ধর্ম্মে যে ধার্ম্মিক, সে ও ধর্ম্মে ধার্ম্মিক নহে। যেমন বস্ত্রের ভিন্নতা, তেমনি বর্ণের ভিন্নতা, তেমনি সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা, সকলই অসার। যেমন বর্ণেতে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, তেমনই জানিবে, কাহারও কাল বুদ্ধি, কাহারও শ্বেত বুদ্ধি। বর্ণের ভিন্নতা কে মানে? অসার মতের প্রভেদ কে মানে? সূক্ষ্মদর্শী লোকে বলে কৃষ্ণ খ্রীষ্ট বেদ পুরাণ, এ সমুদায় বিভিন্নতার নিম্নে ঐক্য আছে। সমস্ত তীর্থ অতিক্রম করিয়া যখন আত্মা সমাধির অবস্থায় ডুবিল, ওঙ্কার ধরিয়া ব্রহ্মে বাণ নিক্ষেপ করিল, ব্রহ্মেতে আত্মা প্রবিষ্ট হইল, তখন অভেদ জ্ঞান। সকল দিকে তখন ব্রহ্মদর্শন; সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সেই ভক্তি, সেই প্রেম, তখন চারিদিকে অভেদ ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল জ্ঞান হৃদয়ে কমিল, আত্মাতে একেবারে বিলুপ্ত হইল। যোগাসনে বসিয়া যদি দেখ, দেখিবে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মূলগত বিবাদ নাই; বেদ পুরাণে বিবাদ নাই, খ্রীষ্ট বিধানের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিবাদ নাই। আত্মা রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলেন, কি আশ্চার্য্য? ঈশার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাদ? কিসে কিসে বিবাদ হয়? অভেদ যেখানে, সেখানে কিরূপে বিবাদ হইবে? সমুদায় সত্যই এক। নববিধানরূপ নূতন শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, ভেদবুদ্ধি অসার। পুরাতন শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম

আর পৃথিবী অভেদ, সকল ভেদজ্ঞানই মায়া; তেমনই নূতন শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, সমুদায় সাম্প্রদায়িক ভেদ-জ্ঞান মায়ার খেলা। ব্রহ্ম যেমন অদ্বিতীয়, ধর্ম্মও অদ্বিতীয়, এবং শাস্ত্র তন্ত্র সাধু মহাত্মাও অদ্বিতীয়। সমুদায় ঋষিতে অভেদ, প্রেরিতে প্রেরিতে অভেদ, মহাপুরুষে মহাপুরুষে অভেদ; ইহাঁদের মধ্যে বিরোধ নাই, সংগ্রাম নাই, পৃথিবীতে দেশবিশেষে ঋষি প্রেমিক মুনি যোগী সংখ্যায় অনেক, কিন্তু সমুদায় অভেদ ও এক। সমুদায় বেদ বেদান্ত এক শাস্ত্র, এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া, এবং চিরদিন সাধন করিব "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া। কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর থাকাতে মায়ার জন্য ভেদজ্ঞান ছিল; এখন সকলে এক হও। ভেদদৃষ্টি করিব না, ভেদসৃষ্টি করিব না, ভেদবুদ্ধির পথে চলিব না। তিন তীর্থ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ তীর্থে যাইবই যাইব; এবং ঈশ্বরপ্রসাদে নিশ্চয়ই তথায় মোক্ষ ও শান্তি লাভ করিব।

হে দয়াসিন্ধু, হে করুণাময়, কল্পনার অতীত তুমি, ভেদাভেদের অতীত তুমি, তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছি। পৃথিবীর অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, এখন এই মিনতি করি, ধর্ম্মরাজ্যে শান্তির পথ দেখাইয়া দাও। নৌকা দুলিতেছে; পাপে পরিপূর্ণ; দুষ্প্রবৃত্তি-বায়ুতে আন্দোলিত হইয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সময়

তোমায় ডাকিতেছি, হরি, কোথায় রহিলে? এ যে মতের তরঙ্গে মারা যাই, এ সময়ে তুমি রক্ষা কর। অনেক লোকে সাম্প্রদায়িক তর্কে মরিতেছে। এই জন্য ঠাকুর, কাঙ্গালদিগের পরিত্রাণের জন্য তোমায় জানাইতেছি, সকল প্রকার ভ্রান্তি ও ভেদ বুদ্ধি হইতে রক্ষা কর। দেহতীর্থে কর্ম্মকাণ্ড, মন তীর্থে জ্ঞানকাণ্ড, হৃদয়তীর্থে কোহাহল শান্তি ও নিবৃত্তির আরম্ভ। কিন্তু আত্মা তীর্থে যোগী ভিন্ন আর কেহই ত শান্তি লাভ করিতে পারে না। সকল তীর্থ দেখা হইল, শান্তি কোথাও পাওয়া গেল না। না বৃন্দাবনে, না কাশীতে, না গয়াতে। শাক্য যখন বিবাদ করেন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে, পৃথিবীতে তখন শান্তি পাইব না। শান্তি পাইব পৃথিবীর অতীত স্থানে, আত্মাতে; যেখানে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নাই, যেখানে কেবলই যোগ। দেখিব সেখানে এক সাধুকে অপর সাধুর বক্ষে। দেখিব সকল মনুষ্য একজাতীয়। দিব্য চক্ষু দাও, হে ঈশ্বর, অভেদ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই। দয়াময়, ব্রাহ্মদের মধ্যেও নানা গোলযোগ নানা বিবাদ হইয়াছে। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া এমন কোন নিভৃত স্থানে বসি, যেখানে কোন গোল নাই, বাগ্‌বিতণ্ডা নাই, কোন ভেদাভেদ নাই। শুনিয়াছি, জগন্নাথের নিকটে থাকিলে সমুদ্রের শব্দ শোনা যায় না। হে কৃপাসিন্ধু, হে জগৎপতি জগন্নাথ, আত্মা তীর্থে যখন বসিব, সমাধিমন্দিরে বসিয়া যখন তোমার মুখশ্রী দেখিব,

তখন প্রেমেতে যোগেতে সব একাকার হইয়া যাইবে। দুরন্ত বিচারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের শব্দ শোনা যাইবে না। একেবারে শান্তিরাজ্য প্রচার কর, মা। বহুকাল হইতে ধর্ম্মের নামে তোমার নামে নানাপ্রকার অশান্তি প্রচারিত হইতেছে। বারণ করিতে পার কেবল তুমি, হে জগজ্জননি, তুমিই কেবল এ সকল বারণ করিতে পার। মাতঃ, কৃপা করিয়া শান্তিরাজ্য প্রচার কর। সকল ধর্ম্ম এক হউক, সকল প্রকার গৃহবিচ্ছেদ চলিয়া যাউক। সকল সম্প্রদায় একবার হরিচরণতলে নৃত্য করুন। বুঝি এ আশা দুরাশা! লোকে বলে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত কলহ বিবাদ ইহা কি যায়? দয়াময়, দেহে, বুদ্ধিতে, কার্য্যে যদিও ভেদাভেদ ও বিবাদ থাকে, যেন যোগেতে সকলে অভেদ দর্শন করিতে পারে। যোগে সকল এক কর। যোগেশ্বর, তোমাকে সকলের মধ্যে দর্শন করি, তোমাতে অপর সকলকে অবলোকন করি। দেখি "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।" আমি তোমাতে, জগৎ শুদ্ধ তোমাতে। এই অভেদ জ্ঞানে জ্ঞানী হইব। আমরা পুলকিত হইয়া বলিব, ভেদাভেদ নাই; জাতীয় বিজাতীয় নাই; কলহ বিবাদ নাই; শান্তি হইল, শান্তি হইল, যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধ হইল। হে দয়াময়, কবে এ কথা পৃথিবী বলিবে? কবে আনন্দে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব? আশার কথা শুনিয়াছি। নূতন শঙ্করাচার্য্য শ্রীনববিধান সার অভেদতত্ত্ব প্রচার করিবেন। ইঁহাকে ক্ষমতা দাও, প্রভুত্ব দাও।

ইনিই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিবেন; সকল সাধুকে এক করিবেন। মা কল্যাণদায়িনি, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্ব্বদেবময় হরি যে তুমি, তোমার চরণতলে আমরা এক হইয়া বসিব। আমাদিগের এক শাস্ত্র, এক জাতি, এক হরি তুমি। শ্রীহরি, সর্ব্বদেবময় হরি, হরি-নাম রসে মাতিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিব। ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তোমার চারিদিকে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব। হে কৃপাময়ি, আত্মার ভিতরে সকলে যেন এক হইয়া যাইতে পারি, পুণ্য ও আনন্দে যেন উন্মত্ত হইতে পারি, দেবি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

মহাজনের অলৌকিক নির্ভর।

রবিবার, ২০ এ ভাদ্র, ১৮০৩ শক।

যাহা লৌকিক তাহা লৌকিক এবং যাহা অলৌকিক তাহাও লৌকিক। যাহা সাধারণরূপে চলিতেছে তাহাও নিয়মে হয়, যাহা সময়ে সময়ে অসাধারণরূপে ঘটিতেছে তাহাও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীন। পৃথিবীর যে সকল ব্যাপার অলৌকিক বলিয়া পরিগণিত, তৎসমুদয়ও লৌকিক নিয়ম দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায়। বাস্তবিক নিয়মের অতীত কোন ঘটনা হয় না, হইতে পারে না; অথচ লৌকিক অলৌকিক দুইই স্বীকার করিতে হইবে। মহাজনদিগের

পক্ষে অলৌকিক ব্যাপার আবশ্যক। অলৌকিক ব্যাপার ভিন্ন সামান্য লক্ষণে মহাজনের সত্য প্রতিপন্ন করা যায় না। পৃথিবী মহাজনের জীবনে অলৌকিক তেজ ও ক্ষমতা দেখিতে চায়। সামান্য সাক্ষ্যদানে মহাজন পৃথিবীর নিকট গৃহীত হন না। পৃথিবী বলে, যদি তুমি মহাজন বলিয়া পরিচিত হইতে যাও, তবে এক খণ্ড রুটি লইয়া শতাধিক লোককে খাওয়াইতে হইবে, এবং এক বিন্দু জলে সহস্রাধিক লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইবে। এ সকল কিংবা এ প্রকার কোন অলৌকিক ক্রিয়া করিতে না পারিলে লোকে তোমাকে মহাজন বলিয়া গ্রহণ করিবে না। মহাজন অথবা অসাধারণ লোক হইলেই সাধারণ লোকের অতীত অলৌকিক কোন ক্ষমতা দেখাইতে হইবে। হে প্রেরিত মহাজন, তুমি সামান্য ক্রিয়া দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইও না। অসামান্য লক্ষণ ভিন্ন কেহই পৃথিবীতে অসাধারণ লোক কিংবা মহাজন বলিয়া গৃহীত হন নাই। যদি সাধারণ লোকের দুষ্প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান চাও, তবে অসাধারণ বিশ্বাস, নির্ভর ও তেজ দেখাইতে হইবে। যদি আপনাকে ঈশ্বরের বিশেষ চিহ্নিত লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তবে আপনার জীবনে অলৌকিক বল অর্থাৎ লোকাতীত দৈববলের চিহ্ন দেখাইতে হইবে। বাস্তবিক আমাদিগের জীবনে যদি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের শক্তি না দেখিতে পাই, তবে আমরা যে অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা

উচ্চতর অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহাজনসম্পর্কে এই একটী অলৌকিক ক্রিয়া লেখা আছে যে, যেখানে আকাশ, শূন্য, কিছুই নাই, সেখানে তিনি তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুদিগের খাদ্য পাইয়াছিলেন। মহাজনেরা মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন;—"কেহ কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না।" "সর্ব্বাগ্রে তোমরা স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে তোমাদিগের যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সে সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" "তোমরা কেবল ধর্ম্মচিন্তা করিবে অর্থাৎ কিরূপে তোমাদের স্বর্গস্থ প্রভুর ইচ্ছা পালন করিবে কেবল সেই বিষয়ে মনোযোগী হইবে, তোমাদিগের প্রভু স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব মোচন করিবেন।" মহাজনেরা যদি আপনাদিগের জীবনের শক্ত ভূমির উপরে পরীক্ষা দ্বারা এই সত্য অনুভব না করিতেন, তাঁহারা যদি আপনার প্রভুর কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেন, তাহা হইলে কখন তাঁহারা পৃথিবীকে এই উপদেশ দিতেন না। মহাজনেরা আপন আপন জীবনে এবং শিষ্য প্রশিষ্যদিগের জীবনে এই সত্যের এত প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা দুর্জ্জয় বিশ্বাসের সহিত জগৎকে বলিয়া গিয়াছেন যে,—"যে কেহ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, এবং সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহার ধন ধান্য হন।" মহাজনদিগের এই কথা তাঁহাদিগের অলৌ-

কিক শক্তির পরিচয় দিতেছে। মহাজনেরা যদি অটল বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিতে না পারিতেন, তাহা হইলে জগতে আজ ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাজনদিগের এত কীর্ত্তি থাকিত না। পৃথিবী কেন মহাজনদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিবে? এবম্প্রকার উচ্চ বিশেষণ তাঁহাদিগকে কেন দিবে? তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা আকাশ ও বায়ুকে অন্ন করিতে পারেন। বিপদ্‌ভঞ্জন ভগবান্ মহাজনদিগকে বলেন, "যেখানে দেখিবে কিছুই খাদ্য সামগ্রী নাই, সেখানে তোমরা সহস্র সহস্র লোকের আহার যোগাইতে পারিবে, তোমাদিগকে এই অলৌকিক শক্তি দেওয়া হইল।" এই অলৌকিক বল এক জন মহাপুরুষের মধ্যে বদ্ধ নহে, দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রায় সকল মহাপুরুষেরাই এই অলৌকিকবলসম্পন্ন হন। মহাজনদিগের এই বলপ্রভাবে সমূহ বিপদের ভিতরে পড়িয়াও তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্যেরা রক্ষা পাইয়াছেন। বাস্তবিক ঈশ্বর যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের কিছুতেই ভয় নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অকিঞ্চন ও নিঃসম্বল হইয়াও পরমধনে ধনী। ঈশ্বরের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহাদিগের টাকা ছিল, তাঁহারা টাকা ফেলিয়া দিলেন, আয়ের যত প্রকার উপায় ছিল সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন, আর যাঁহাদের টাকা

ছিল না তাঁহারা বলিলেন,—"আমাদের সখা চড়াই পক্ষীকে আমাদিগের দয়াময় স্রষ্টা খাইতে দেন, আমরা তাঁহার ভক্তদাস আমাদিগকে কি তিনি পরিত্যাগ করিবেন?" বাস্তবিক যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী হন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহাদিগের উত্তরাধিকার হয়, তাঁহাদিগের কোন অভাব থাকে না। কথিত আছে, পূর্ব্বতন যোগী ঋষি এবং সন্ন্যাসী তপস্বিগণ পর্ব্বতশিখরে অথবা গভীর অরণ্য মধ্যে বসিয়া যোগ তপস্যা করিতেন, আকাশ হইতে তাঁহাদিগের জন্য খাদ্য বর্ষণ হইত। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে তোমাদিগকে সে সকল অযথার্থ অলৌকিক ক্রিয়া বিশ্বাস করিতে বলা হইতেছে না। প্রকৃত মহাজনেরা সে সকল বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের অলৌকিকতা প্রমাণ করেন না। পাঁচখানি রুটি দিয়া পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াইয়া কিংবা জলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া সামান্য লোকসকলকে চমকিত করিয়া তাহাদিগের শ্রদ্ধা উদ্দীপন করা মহাজনদিগের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তাঁহারা অন্ন চিন্তা না করিয়াও অন্ন লাভ করেন, ইহাই তাঁহাদিগের অলৌকিক ক্ষমতা। তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম করেন না, অথবা অর্থোপার্জ্জনের জন্য অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করেন না; অথচ তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার জন্য ধন ধান্য আসে কিরূপে? তাঁহারা লোকের কাছে গিয়া ভিক্ষা করেন না, অথচ তাঁহাদিগের জন্য অন্ন

বস্ত্র আসে কিরূপে ? এই নিগূঢ় তত্ত্ব যদি তুমি বুঝিতে, কিংবা যদি আমি বুঝিতাম, তাহা হইলে আমরা মহাজন-দিগকে এত আদর করিতাম না। আমরা যেমন বিষয় কর্ম্ম করিয়া দশ পাঁচ টাকা অর্জ্জন করিয়া আনি, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাজনেরা যদি সেরূপ করিতেন, তাঁহা-দিগকে আমরা মহাজন বলিতাম না। যদি তাঁহারা সাধা-রণ লোকদিগের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম "ঈশা মুষার ধর্ম্মভাব আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল সত্য বটে ; কিন্তু তাঁহারাও সাধারণ লোকদি-গের ন্যায় সামান্য সামান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করি-তেন।" কিন্তু বাস্তবিক মহাজনগণ সাধারণ লোকদিগের শ্রেণীবহির্ভূত। সাধারণ লোকেরা বলে, আমরা এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, মহাজনেরা বলেন এ সকল অবি-শ্বাস ও নাস্তিকতার ব্যবহার। সাধারণ লোকেরা বলে, আমরা যদি চাকরী করিয়া টাকা না আনি, তবে আমাদিগের স্ত্রী পুত্রাদির অন্ন বস্ত্র কোথা হইতে আসিবে ? এ সকল শুনিয়া মহাজনেরা তাহাদিগকে কলঙ্কিত নাস্তিক মনে করেন। সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ঈশ্বরাবমাননা যেমন পাপ, মহাজনদিগের পক্ষে কল্যকার জন্য চিন্তা করা তেমনই অধর্ম্ম। তাঁহারা কল্যকার জন্য ভাবিতেন না, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা পাখীর ন্যায় প্রফুল্ল থাকিতেন। ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও দয়ার উপরে কদাচ তাঁহাদিগের সন্দেহ হইত

না। যাহারা ঈশ্বরের প্রেমে অবিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত। ভক্ত মহাজনদিগের হস্তে ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারের চাবি দান করেন। তাঁহাদিগের আর ভয় ভাবনা থাকিবে কেন? পাহাড়ের উপরে যোগী বসিয়া যোগ ধ্যান করিতেছেন, লোকালয় হইতে বহু দূরে গঙ্গাতীরে বসিয়া ভক্ত ভক্তিসাধন করিতেছেন, কে তাঁহাদিগকে অন্ন দেয়? পাখীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যিনি আকাশের পক্ষিসকলকে আহার দেন, যিনি জলের মৎস্যসকলের প্রাণ রক্ষা করেন, যিনি অরণ্যের পশুসকলকে তাহাদিগের উপযুক্ত খাদ্য দেন, তিনিই তাঁহার সর্ব্বত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীদিগকে আহার দান করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত মাহজনদিগকে বলেন; "তোমরা যদি সামান্য বিষয়ী ও কৃষকদিগের মত ধন ধান্য অর্জন কর, তাহা হইলে আমার নাম ডুবিবে। তোমরা অসাধারণ প্রণালীতে তোমাদিগের অন্ন ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বস্তু সকল লাভ করিবে, তোমরা প্রস্তর আঘাত করিবে, আর প্রস্তরের ভিতর হইতে জল বাহির হইবে, তোমরা আকাশের পানে তাকাইবে, আর আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য খাদ্য আসিবে; তোমরা কেবল আমার দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং আমার ইচ্ছা পালন করিবে, তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইবে, আমি স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব মোচন করিতেছি। তোমরা যদি তোমাদিগের আত্মীয় বন্ধু কি খাইবে, এই ভাবনায় ভীত

হও, তাহা হইলে পলকের মধ্যে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, বিশ্বাস নির্ভর চলিয়া যাইবে এবং সত্যসূর্য্য অস্তমিত হইবে। তোমরা পৃথিবীকে অলৌকিক বিশ্বাস ও নির্ভরের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।'' যাঁহারা ঈশ্বরের দাস, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা আপনাদিগের অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তিত হইবেন না। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদিগের জীবিকার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বর নিজে পৃথিবীর মনে তাঁহার সাধু ভক্তদিগের সেবা করিবার জন্য ইচ্ছা ও ভাব উত্তেজিত করেন। সাধুর নামে সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই যে আমরা এই দুষ্ট পৃথিবীর মধ্যেও ভক্তের প্রতি এত আদর দেখিতে পাই, ইহা কেবল সাক্ষাৎ ঈশ্বরের লীলা। সাধুর অন্নসংস্থান নাই, সাধুর গাত্রে বস্ত্র নাই, ইহা দেখিলে পৃথিবীর মনে কষ্ট হয়। পৃথিবীর বড় বড় ধনী রাজারা পর্য্যন্ত মান অপমান চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত ব্রহ্মচারীদিগের সেবায় নিযুক্ত হন। পরমহংসের সেবায় নিযুক্ত হইলে পৃথিবী আপনাকে পবিত্র মনে করে। এক দিকে যেমন ভগবান্ ভক্তদিগকে কেবল তাঁহার পূজা ও দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, অন্য দিকে আবার পৃথিবীতে তাঁহাদিগের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এক দিকে ঈশ্বর ভক্তদিগকে বলিলেন ;—"সাবধান, তোমরা কল্যকার জন্য ভাবিও না। তোমরা কি খাইবে, কি পরিবে, এই চিন্তা করিও না। তোমরা কেবল কিরূপে পৃথিবীতে

আমার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবে এই চিন্তা কর।" অন্য দিকে তিনি পৃথিবীকে এই বলিয়া দিলেন; "হে পৃথিবীর লোক-সকল, তোমরা আমার ভক্তদিগের সেবা কর, তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার উপায় সকল সর্ব্বদা ভাব।" এই রূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে এক দিকের অভাব আর এক দিকের ভাব দ্বারা সামঞ্জস্য হয়। সাধু ভক্তগণ আপনাদিগের জন্য চিন্তা না করিয়া উচ্চতম বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, অন্য দিকে পৃথিবী তাঁহাদিগের জন্য চিন্তা করিয়া সাধুসেবার পবিত্র দৃষ্টান্ত দেখায়। ধন্য ঈশ্বর, যিনি দেশে দেশে যুগে যুগে এ সকল অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। যে ভগবানের শরণ লয়, তার কি দুঃখ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন,—"ভক্ত আমার বন্ধু, ভক্তকে দেখিলে আমার আনন্দ হয়, আমার ভক্ত অন্নাভাবে মরিবে, ইহা কি আমার সহ্য হয়। আমি আমার ভক্তের জীবিকার উপায় করিয়া দিবই দিব। যে আমার হাতে ভার দেয়, আমি তাহাকে রক্ষা করিবই করিব।" বাস্তবিক করুণাময়ী ভক্তবৎসলা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মা তাঁহার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি কত দূর দূরান্তর দেশীয় লোকের মনে ভক্তের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন।

প্রত্যাদিষ্ট।

রবিবার, ১লা পৌষ, ১৮০৩ শক।

যে সকল বস্তু এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল বস্তুর সংসারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, এ সকলের মধ্যেও স্বর্গের কিছু কিছু দ্রব্য আছে। এই সংসারে স্বর্গীয় এবং পার্থিব বস্তু সকল মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা এই দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন, কোন্‌টি স্বর্গীয় কোন্‌টি পৃথিবীর। লক্ষণ দেখিয়া চেনা যায় কোন্‌টি স্বর্গীয়, এবং কোন্‌টি পার্থিব। পৃথিবীর বস্তু ত মলিন আছেই, কিন্তু আপাততঃ অনেক মলিন বস্তুর মধ্যেও স্বর্গীয় পদার্থ লুক্কায়িত থাকে। অনেক মানুষ আছে যাহারা মানুষ, আবার অনেক মানুষ আছেন যাহাদের ভিতরের প্রকৃতি দেবতার প্রকৃতি। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান্ আছে, যাহাদের বুদ্ধি, পৃথিবীর বুদ্ধি। আবার এখানে এমন লোকও আছেন, যাঁহাদিগের চক্ষু কর্ণ স্বর্গে উৎপন্ন স্বর্গে গঠিত। চক্ষু কাহার না আছে? কিন্তু কে স্বর্গের শোভা দেখিতে পায়? কাণ কাহার না আছে, কিন্তু কয় জন লোকের কর্ণ স্বর্গের শব্দ শুনিতে পায়? এই পৃথিবীতে স্বর্গের পুস্তক এবং মনুষ্যরচিত পুস্তকও রাশি রাশি আছে। আমাদের সমক্ষে স্বর্গীয়, পার্থিব দুইই রহিয়াছে; কিন্তু এমন বিচক্ষণ চক্ষু

কাহার যে, দুগ্ধ এবং জল পৃথক্ করিতে পারে? অথচ পার্থিব হইতে স্বর্গীয় বস্তু বাছিয়া লইতেই হইবে। পার্থিব পুস্তকের মধ্যে অনেক ভাল ভাল পুস্তক আছে বলিয়া সমুদয়কে মনুষ্যের রচিত মনে করা উচিত নহে। কোন্ পুস্তকে কাহার নাম অঙ্কিত আছে, তাহা দেখিতে হইবে। রত্ন ধন বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায়ই পৃথিবীতে মিশ্রিত ভাবে স্থিত, কিন্তু তাহার মধ্যেও পার্থিব ও স্বর্গীয় বিভাগ আছে। মনুষ্যসম্বন্ধেও এইরূপ ধার্ম্মিক সংসারী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসেন। ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ঈশ্বরের ক্ষমা, ঈশ্বরের উৎসাহ, মনুষ্যের আকার ধরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, নিগূঢ়তত্ত্বদর্শীরা এ সকল দেখিয়া আমোদ করেন। এই সমক্ষে দেখ, টাকা কড়ী ধন রত্ন মনুষ্য কত কি আছে। যাঁহারা বিচক্ষণ ভক্ত তাঁহারা বলিলেন, এই ধন রত্ন ঈশ্বরের, এই ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর; এই পাঁচটি লোক স্বর্গের চিহ্নিত লোক, এই পাঁচ লক্ষ লোক পৃথিবীর লোক। অনেক জিনিষ আছে যাহা পৃথিবীতে উপার্জ্জন করা যায় যেমন টাকা বিদ্যা; কিন্তু এমনও অনেক জিনিষ আছে, যাহা কেবল ঈশ্বরেরই নিকট পাওয়া যায়; যেমন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। ইহা পৃথিবীর কোন স্থানে কিংবা কোন মনুষ্যের নিকট পাওয়া যায় না। মানুষ জন্মে কোথায়? মাতৃগর্ভে। কিন্তু যখনই স্বর্গীয় পুরুষের জন্ম হয়, তখনই ঈশ্বর তাঁহার রক্তের

মধ্যে স্বর্গের ভার দিয়া তাঁহাকে গঠন করেন। দশটি স্বর্গের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাকে দেখিয়া জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী ধন্য হয়। তিনি জন্মসন্ন্যাসী, প্রেরিত ঋষি, তিনি জগতের আদরের গোপাল, তিনি প্রেরিত শিশু, তাঁহাকে দেখিয়া পৃথিবী বলিল, আমাদের গুরু আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার গুরুত্ব বুঝিল। তাঁহার জিহ্বাই বেদ, তাঁহার জীবনই শাস্ত্র, তিনি জন্ম-সাধক, তিনি জন্মযোগী। তাঁহার এক একটী কথা শুনিয়া লোকে বলিবে, ইহার এক একটী কথা স্বর্গের অভ্রান্ত দেববাণী। এই এক শ্রেণীর লোকের কথা। ইহাঁ-দিগের সমস্ত জীবনই সত্যপূর্ণ। পৃথিবীতে ইহাঁদিগের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া পরে এমন এক শ্রেণীতে আসিলাম, যাঁহাদিগের জীবনে দুই আনা সত্য লাভ করা যায়। জন্মসাধুর জীবনে ষোল আনা পূর্ণ সত্য লাভ করা যায়, এই শ্রেণীর লোকের নিকট দুই আনা প্রত্যাদেশ লাভ করা যায়। ব্রাহ্ম স্বর্গের কোন পদার্থ অবহেলা করিতে পারেন না। অতএব যাঁহাদিগের জীবনে কেবল দুই আনা সত্য, আমরা তাঁহাদিগের জীবন হইতেও স্বর্গের ফুলগুলি তুলিয়া লইব। ব্রাহ্ম বাগানের মালী হইয়া জন্মিয়াছেন। তিনি কেবল নানা স্থান হইতে স্বর্গের ফুল গুলি তুলিয়া মালা গাঁথিবেন। কোন কোন বৃক্ষে দুই একটি ফুল ফুটিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্ম-মালী

তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বিচার করিবার তাঁহার অধিকার নাই। অল্প হউক অধিক হউক, সকল বৃক্ষ হইতেই তাঁহাকে স্বর্গের ফুল তুলিয়া লইতে হইবে। অতি সামান্য লোকের জীবনেও যদি একটি স্বর্গের ফুল ফুটিয়া থাকে, আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটী লোকের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের একটী অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। ব্রাহ্ম সেই তেজের নিকট আপনার মস্তক নত করিলেন। একটি লোক তাহার সমস্ত জীবনে একটী স্বর্গের কথা বলিল, তাহাতেই সে ধন্য হইল। একটি সামান্য লোক ঈশ্বর প্রেরিত এক জন সাধুকে বলিল ;—"তুমি ঈশ্বরের পুত্র, তোমাকে দেখিয়া আমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গরাজ্যের আশা হইল।" এই কথা স্বর্গের কথা। মনে কর, সেই ব্যক্তি তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে আর একটীও স্বর্গের কথা বলে নাই ; কিন্তু তথাপি তাহার এই একটী কথাকেই স্বর্গের অমূল্য রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর এক জন লোক দৈবাৎ তাহার শত্রুর প্রতি মধুর ব্যবহার করিল, হয়ত সে নিজেই বুঝিতে পারিল না কেন সে এরূপ অনুষ্ঠান করিল। সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক, শত্রুর প্রতি তাহার এই প্রেম ব্যবহার স্বর্গের ব্যাপার, চারি দিকে পার্থিব ব্যাপার ; কিন্তু এই দুইটি জিনিষ স্বর্গের। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে যাহারা প্রত্যাদিষ্ট, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইতে যাহারা

নিয়োগপত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর রাশি রাশি বস্তুর মধ্য হইতে স্বর্গের বস্তু বাছিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা লক্ষণ দেখিয়া স্বর্গীয় পদার্থ চিনিতে পারেন। যাহারা প্রত্যাদেশ পায় না, তাহারা ঈশ্বর এবং মূল সত্যের গৌরব বুঝিতে পারে না। তাহারা অনেক সময় সত্যকে মিথ্যা মনে করে এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে। পৃথিবীতে যে শ্রেণীর লোক যিনি, তাঁহাকে সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যাদেশের পরিমাণ অনুসারে মনুষ্যমণ্ডলীকে শ্রেণীবদ্ধ করা কল্পনার কার্য্য নহে, ইহাতে বিজ্ঞান আছে। যেমন ঈশ্বর আছেন সত্য, তেমনই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, সত্য, উৎসাহ ইত্যাদি মনুষ্যের আত্মা এবং বাহু মধ্যে আসে ইহাও সত্য। আমরা অনেক বৎসর হইতে ইহার প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ইহার সাক্ষ্য দান করিব, এবং আমরা যতই বৃদ্ধ হইতে থাকিব, ততই আমাদিগের এই বিশ্বাস ঘনতর হইতে থাকিবে। আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ; যাঁহাদিগের চরিত্র মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের কএক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য কিং বা

ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য। যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বায়ু বুরিতেছে, তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হন, ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাইবেন, ইহা সত্য কথা নহে। অথবা যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে সকল বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা। যিনি ক্ষমা বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি হয়ত অন্য বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না। সরল সাধকেরা কখনও মিথ্যা বলেন না। তাঁহারা কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান এবং কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না, সকলই অকপট ভাবে স্বীকার করেন, আপনারাই বলেন। যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট, লক্ষণ দেখিলেই তাঁহাদিগকে চেনা যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে। তাঁহারা আপনারাই বলেন, এই এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। আদেশ পাইলেই কার্য্যভার লইতে হয়। তুমি মুখে বলিতেছ, প্রত্যাদেশ পাইয়াছ, অথচ তুমি যদি সেই আদিষ্ট কার্য্য না কর, তুমি প্রবঞ্চক। তুমি স্বীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শমাত্র

কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপাসক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এইরূপ না হয়, তুমি প্রবঞ্চক। ঈশ্বর এক এক জনকে এক একটি বিশেষ কার্য্য ভার দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন। প্রত্যেকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলেই তাহার নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হয়। তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রু দিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতে জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছ, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্য লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। অতএব কার্য্যের জন্য অহ-স্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচখানি কার্য্য আছে, আমার না হয় দুই খানি কাজ আছে, তাহাতে আমার দুঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাঁধিতে আসিয়াছেন, তাঁহার বাদ্যে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্দ্র প্রকাশ করিতে আসি-য়াছেন, তিনি যেন বিনয় অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন, তিনি

যেন স্বর্গের আর কোন লক্ষণ দেখাইতে অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও। কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না। যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত, তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্যসম্পর্কে তাঁহার যত দূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বর নিঃশ্বাস পাইবেন, এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আনিয়া দিবে। অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। যিনি স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত লিখিতে থাকুন; যিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত সঙ্গীতের উন্নতি করিতে থাকুন, তাঁহারা প্রতিজনেই আপন আপন কার্য্যে স্বর্গ হইতে সাহায্য লাভ করিবেন এবং পৃথিবীও তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিবে। যাঁহারা শিশু, যুবা অথবা নারী চরিত্র গঠন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন বিষয়ে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন প্রত্যাদেশ লাভ করিবেন। যাঁহারা পাপী জগতের মধ্যে পুণ্য বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে স্বর্গ হইতে রন্ধন করা পুণ্যের

অন্ন সকল আসিবে। অতএব আচার্য্যগণ, প্রচারকগণ, তোমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত আপন আপন হৃদয় এবং জীবনের উপযুক্ততা অনুসারে প্রতিজন কেবল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কর, তাহা হইলে চারি দিকে কল্যাণের উৎস সকল উৎসারিত হইবে।

দ্বিবিধ নাস্তিকতা।

রবিবার, ২৬ এ আশ্বিন, ১৮০৩ শক।

অবিশ্বাসীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঈশ্বরকে যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা প্রথম শ্রেণীর অবিশ্বাসী; যাহারা ঈশ্বরবাণী অবিশ্বাস করে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবিশ্বাসী। চলিত ভাষায় বলিতে হইলে বলা যায়, যাহারা ঈশ্বরকে না মানে তাহারা নাস্তিক; শাস্ত্রকে যাহারা না মানে তাহারাও নাস্তিক। যদি কেহ ঈশ্বরকে মানিয়া শাস্ত্রে অবিশ্বাস করে, তাহা হইলে সকল দেশে তাহাকে নাস্তিক বলে। ইহার কি কোন অর্থ নাই? আমি ঈশ্বরকে মানিব, তাঁহাকে সাধন করিব, তাঁহার গুণ গান করিব, তাঁহার শাস্ত্র নাই বা মানিলাম ইহাতে কি দোষ? কি অপরাধ? ব্রহ্মের যাবতীয় স্বরূপ এক এক করিয়া মানিব। ব্রহ্মের সমুদয় লক্ষণ বেদ বেদান্ত সহকারে প্রতিপন্ন কর, আমি অনায়াসে সায় দিব, কিন্তু শাস্ত্র মানিব না।

কেবল ব্রহ্মকে মানিয়া কি বিশ্বাসীদের দলে স্থান পাইতে পারি না? পৃথিবী কেন আমাকে বিশ্বাসী বলে না? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে ঘৃণার অঙ্গুলি, অবজ্ঞার অঙ্গুলি ও দয়ার অঙ্গুলি আমার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কেন বলে, দেখ দেখ, ঐ নাস্তিক যায় দেখ। শাস্ত্র না মানিলে কি নাস্তিক হইতে হয়? ঈশ্বরের সঙ্গে শাস্ত্রের কি যোগ আছে? যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের মুখের যোগ, তেমনই ব্রহ্মকে বিশ্বাস করার সঙ্গে ব্রহ্মের আদেশে বিশ্বাস করার যোগ। ঈশ্বরের আদেশ, অনন্ত বেদ। ঐ বেদ না মানিলে সকলেই তোমাকে নাস্তিক বলিবে। এই ব্রহ্মমন্দিরও তোমাকে নাস্তিক বলিতে ছাড়িবে না। আমাদের ধর্ম্মেও তুমি নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুমি বলিবে, ইহার কারণ জানিতে চাই। কারণ জানিতে চাও? তবে শ্রবণ কর। যে বলিল, ঈশ্বর নাই, সে মতে নাস্তিক, বিশ্বাসে নাস্তিক। যে বলিল, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি কথা কন না, নিরাকার বলিয়া তিনি কোন আদেশ করেন না, সে ব্যক্তি ব্যবহারে নাস্তিক, কার্য্যে নাস্তিক। পণ্ডিতগণ, বিচার কর, অধিক অনিষ্টকারী কোন্ শ্রেণীর নাস্তিক? যে বলিল, ঈশ্বর নাই, সকলেই তাহাকে দেখিয়া সাবধান হইবে। সাপ আসিল বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবে, গৃহস্থ পুত্র কন্যাগণকে সাবধান করিবে। সেই যে ভয়ানক হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রতুল্য নাস্তিক, সে যখন আগমন করে, বোধ হয়

স্বয়ং মৃত্যু যেন নগরে প্রবেশ করিতেছে। সকলে 'সাবধান! সাবধান!' বলিতে থাকে। উহাতে গৃহস্থ যথা সময়ে সতর্ক হয় ও লোকরক্ষা হয়। নাস্তিক যখন নগরে প্রবেশ করে, স্বয়ং মৃত্যু যেন নাস্তিকের আকার ধারণ করিয়া প্রবিষ্ট হয়। ঐ রাজধানীতে নাস্তিক এক দল প্রবেশ করিতেছে; শুনিবামাত্র লোকে যাহাতে উহারা প্রবেশ করিতে না পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে যত ভয় করি, তদপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে অধিক ভয় করি। প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকেরা মুখে নাকি স্বীকার করে, ঈশ্বর মানি না, কথায় না কি বলে, ঈশ্বর নাই, এই জন্য ধর্ম্মসমাজকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক এত ভয়ানক কেন? কেন না, যে এই শ্রেণীর নাস্তিক, সে বলে, আমি ব্রাহ্ম, আমি ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত, আমি ব্রহ্মবাদী, আমি ব্রহ্মবিশ্বাসী ব্রহ্মযোগী; আমি ঈশ্বরকে ডাকি, তাঁহার নাম কীর্ত্তনও করি, ব্রহ্মনাম আমার রসনাতে লাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে যাই লোকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া সমাদর করে। এই যে লোক, ভয়ানক প্রবঞ্চক। ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরবাণী বিশ্বাস না করিলে কি দোষ? দোষ এই, যে ঈশ্বরকে মানে, ঈশ্বর যাহা বলিলেন তাহা সে মানে না। ঈশ্বর কি আদেশ করিতে পারেন না? তিনি কি কথা কন না? শাস্ত্র কি হইতে পারে না? পিতা মাতাকে মান্য

কর, সত্য বল, এমন সব বিষয়েও কি তাঁহার আদেশ নাই? ভাত খাও ক্ষুধার সময়; জল পান কর তৃষ্ণা হইলে, ইহা কি তিনি বলেন না? বিদ্যা শিক্ষা কর, এ কথা কি ঈশ্বরের আদেশ নয়? প্রতিদিন উপাসনা কর, এ বিধির কি দলিল নাই? কেহ কি সাক্ষ্য দিতে পার না যে, ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছ? তবে কর কেন? আমাদের জ্ঞানে উচিত বোধ হয় বলিয়া। অন্যথা এক সীমা হইতে দেশের আর এক সীমা পর্য্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা কর, কেহই বলিবে না ইহা তাঁহার অভিপ্রেত। এইটি করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা কেহই বলিতে পারে না। ঈশ্বরবাণী কি শোনা যায়? কি ভয়ানক ব্রহ্মজ্ঞ তুমি? তুমি খাও কেন? তুমি ধর্ম্ম সাধন কর কেন? গরিবকে কেন টাকা দাও? ক্ষুধিতকে কেন অন্ন দাও? পথিককে ঘরে লইয়া গিয়া সমাদর কেন কর? ঈশ্বর বলেন নাই নিশ্চয় জান? নিশ্চয় জানি। তবে এ সকল কর কেন? আমার করা ভাল বোধ হয় তাই করি। তবে যাহা তোমার ভাল বলিয়া বোধ হয়, তুমি তাহার উপর নির্ভর করিয়াছ। তোমার বুদ্ধি তোমার পরিত্রাণের নেতা হইয়াছে, তুমিই তোমার মুক্তির সোপান হইয়াছ? তুমি কপট ধূর্ত্ত। তুমি ঈশ্বরকে জ্ঞানে বিশ্বাস কর, ব্যবহারে ঈশ্বর না থাকিলে যেমন লোকে করে, তুমি ঠিক তেমনই কর। তুমি সন্তানের মস্তক যে কাটিবে না তার প্রমাণ কি? তুমি যে অনায়াসে তাহা করিতে পার।

না, আমি তাহা পারি না, কেন না আমার মনে হয় উহা ভাল কর্ম্ম নয়। তোমার যা মনে হয় তাহাই তোমার শাস্ত্র? তাহাই তোমার মুক্তি? তোমার বুদ্ধি কি বেদ? নাস্তিক কি বলে? নাস্তিক তুমি কি বল? আমিও ঠিক ঐ কথা বলি। ঈশ্বর কি বলিয়াছেন, কি না বলিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় হয় নাই। কিছু কি ঠিক করিয়া বলা যায়? ঈশ্বরবাণী আবার কি? তবে এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে এক জন বিদ্যালয়ে পড়িয়া বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত করিয়াছে, আর এক জন বুদ্ধিকে তেমন মার্জ্জিত করে নাই। এক জন মুখে নাস্তিক, আর এক জন কার্য্যে নাস্তিক। এক জনের যুক্তি কিছুমাত্র নাই যে ধর্ম্মকে প্রমাণিত করিবে, আর এক জন আপন হস্তে আপনার পরিত্রাণ সাধন করিতে উদ্যত। ঈশ্বর যে মানে না সেও নাস্তিক, শাস্ত্র যে মানে না সেও নাস্তিক। শাস্ত্র যে মানে না আমরা তাহাকে মানি না; তাহার ভ্রষ্টাচার আমরা অনুমোদন করি না। ঈশ্বরকে মানা অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী মানা আবশ্যক। ঈশ্বর মানিয়া ঈশ্বরের বাণী অস্বীকার করা কিরূপ? ঈশ্বরকে অর্দ্ধেক গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধেক অস্বীকার করা যেরূপ! ব্যবহারে যদি নাস্তিক হয়, কার্য্যে যদি নাস্তিক হয়, তবে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকের দলে গণ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান বংশ তাহাকে মর্য্যাদা দিতে পারে, কিন্তু যে বংশ আসিতেছে, সে

বংশ কখনই মর্য্যাদা দিবে না, তাহারা ঘৃণা করিবে, প্রচ্ছন্ন নাস্তিককে সুক্ষ্মরূপে বিচারিত হইতে হইবে। পৃথিবী বলিবে, মুখে ইহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে।

ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বরবাণীই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্ম হইতে বেদ বড় লোকে বলিয়া থাকে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ব্রহ্ম যদি না বলেন, "আমি আছি," আমি মানিব না। তিনি আগে কথা কন, "আমি আছি" "আমি আছি" বলেন, পরে তাঁহাকে বিশ্বাস করি। না বলিলে কি বিশ্বাস করিতে পারিতাম? না কথা কহিলে কি বিশ্বাস করা যায়? শব পড়িয়া রহিয়াছে। সে "আমি আছি" বলে না, বলিতে পারে না। সেই জন্যই মনুষ্যাকৃতি থাকিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। জাগ্রত জীবন্ত ব্রহ্ম আছেন যেমন বলিব, তেমনই বলিব, তিনি কথা কন; তিনি বলেন 'আমি আছি।' যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে কি লেখা আছে? ঈশ্বরসত্ত্বাবিশ্বাসের মূলে তাঁহার 'আমি আছি' এই বাণী। 'আমি আছি' এই কথার মধ্যে যে বেদ ইহা ঋক যজু সাম অথর্ব্ব বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রথমেই এই 'আমি আছি' বেদ ব্রহ্মমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যেমনই ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাণ্ডকে চমকিত করিয়া আকাশকে বিকম্পিত করিয়া 'আমি আছি,' 'আমি আছি,' বলিলেন অমনি তাঁহার উপাসনা হইল, স্তব স্তুতি

পঠিত হইতে লাগিল, সংগীত সহকারে চারি দিকে অর্চ্চনা আরম্ভ হইল। 'আমি আছি' শব্দ যখন বন্ধ ছিল, তখন বেদের প্রথম পৃষ্ঠাও রচিত হয় নাই। যাই ব্রহ্ম 'আমি আছি' বলিলেন, অমনি পূজা হইল, হরিসংকীর্ত্তন হইল। তবে ঈশ্বর বড় না ঈশ্বরবাণী বড়? আমি বলি, ঈশ্বর অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী বড়। আমাদিগের নিকট ঈশ্বরবাণীর আদর অধিক। কেন না এই বাণীই আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবে। পথ বড় না ঘর বড়? পথের আদর করিলে ঘরে যাওয়া যায়। আমি যে বলিব, ঈশ্বর আছেন, আগে আমার ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা আবশ্যক। পর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মসাগরের মধ্যে ব্রহ্ম; দক্ষিণে বামে, উর্দ্ধে অধোতে ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকিয়া আছি আছি' এই বেদ বাক্য, এই প্রাচীন কথা উচ্চারণ করিতেছেন। যাই জীব শুনিতে পাইলেন, শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। যদি তুমি বল, ব্রহ্মকে মান, কিন্তু তাঁহার কথা শোন নাই, তবে আমি জানি না, তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক। এই গেল প্রথম কথা। পরে আমি জিজ্ঞাসা করি; হে মানব, তুমি আহার কর, কিসের জন্য? ক্ষুধা শব্দের অর্থ কি? দেহগুরু, জগদ্গুরু ক্ষুধার ভিতর দিয়া আদেশ করিতেছেন, 'আহার কর।' প্রথম পরিচ্ছেদে যিনি 'আমি আছি, আমি আছি' বলেন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি 'তুমি খাও, তুমি যাও, তুমি কাজ কর' বলিয়া কথা কন। এই যে ক্ষুধার সময়

আহার করিয়া আমরা শরীরকে স্বচ্ছন্দে রাখি, ইহা কোথা হইতে আসিল? যদি তিনি না বলিতেন, ক্ষুধা কি আসিত? বল, খাইব না। এমন আদেশ আসিল যে, খাইতেই হইবে। তুমি অনুভব করিতেছ, এমন শক্তি আছে যাহা বলপূর্ব্বক খাওয়াইয়া থাকে। ক্ষুধা সহজ নয়। রাজা অপেক্ষা ক্ষুধা বড়। ক্ষুধা গুরু পরম গুরু। ক্ষুধাকে জগতের গুরু বলি কেন? বারংবার বলিব। ইহার মধ্যে এমন এক খানি বেদ আছে যে, কোন ক্রমেই ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। বরং ঋগ্বেদে ভ্রম বাহির করিতে পারি, কিন্তু ক্ষুধাবেদ অভ্রান্তবেদ। ক্ষুধার অবস্থায় আহার দ্বারা শরীরকে রক্ষা করিবে, ঈশ্বরের ইহা আদেশ। কে পুস্তক পড়িয়া অন্ন খায়? সামান্য সামান্য বিষয়ে যখন আদেশ হয়, তখন বড় বিষয়ে কি হয় না? পূজা কর, ইহা কি ঈশ্বর বলেন না? তুমি কি বল, ঈশ্বরের কথা বলিবার শক্তি নাই? বাহির হও নাস্তিক। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকরূপে তুমি অবস্থান করিতেছ, নরনারীর প্রাণ নাশ করিবে? তুমি বল ঈশ্বর বাণীর যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই? প্রকাণ্ড বজ্রধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে তিনি বলিতেছেন, শরীর পোষণের জন্য আহার কর, আত্মার রক্ষার জন্য উপাসনা কর। কাহার কথা? সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানাও যেমন, সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ মানাও তেমনি। দুই সমান। ঈশ্বর আছেন বলাও যেমন, তিনি কথা কন স্বীকার করাও তেমনি।

এ দুই বিচ্ছিন্ন কর; বিচ্ছিন্ন করিয়া বল, আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি ভাল বোধ হয় বলিয়া,অথবা অমুক বন্ধু বলিয়াছেন বলিয়া ; আমি তোমার কথায় সায় দিব না, লোকের কথায় উপাসনা করিব না। উপাসনা করিব মানুষের কথায় ? মানুষ এখন যাহাকে ভাল বলে, দুই ঘণ্টা পরে যদি তাহাকে মন্দ বলে ? তুমি নিজের বুদ্ধিতে ভাল লাগে বলিয়া উপাসনা কর? অহঙ্কারী মানব, তুমি পর্ব্বতকে রাখিতেছ চুলের উপর ! ঘর বাঁধিতেছ, ঘরের পত্তন ভূমি নাই ! আকাশে পর্ব্বত স্থাপন, গোড়াতে ঈশ্বরবাণী নাই, ফল লইয়া আমোদ করিতেছ, মূলের দিকে দৃষ্টি নাই, কি ভয়ানক ব্যাপার ! ঈশ্বরবাণী না মানা কি ভয়ানক ! কাল সকাল হইতে না হইতে ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মবিশ্বাস, সকলে মিলিয়া নগরকীর্ত্তন, সকলই চলিয়া যাইতে পারে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, হয়ত কতকগুলি লোকের কথায় তুমি মনে করিতে পার, সে সকলও তেমনি তিরোহিত হইল। অহঙ্কার করিও না; বলিও না, কাপড় পরি, আহার করি, গরিবকে টাকা দিই সংস্কার বশতঃ। ভাল লাগে বলিয়া তুমি হরিনাম কর ? অন্য সব ব্যাপারের তোমার প্রমাণ আছে, কেবল এই ঈশ্বরবাণীর প্রমাণ তুমি পাও না ? তোমার পুত্রের মস্তক যে তুমি কাটিবে না, তাহা কে বলিল ? অবস্থায় পড়িলে তোমার সম্বন্ধে এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তোমার সমস্ত জীবনটা নাস্তিক।

তোমার গৃহ ভিত্তিশূন্য। যখন বৃষ্টি পড়িবে, পত্তনভূমি আন্দোলিত হইবে, ঝুপ ঝাপ করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী পড়িয়া যাইবে। বৃক্ষতলে বসিয়া তুমি ফলরাশি দেখিতেছ, কিন্তু অবিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন কীট যে সব কাটিয়া ফেলিল দেখিলে না? দেখ গোড়া একেবারে কাটিয়া শূন্য করিল। মড় মড় করিয়া পড়িল বৃহৎ তরু। কোথায় ফল, কোথায় ছায়া? সেই জন্যই বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এখনও দিন আছে, সাবধান হও। শমন নিকটে, এখনও আসে নাই। ঈশ্বরবাণী শ্রবণ কর। ঈশ্বরবাণীতে অবিশ্বাস করিও না। ইহা অবিশ্বাস করিয়া কেহ বাঁচে নাই। কেবল ঈশ্বর বিশ্বাস করিলে চলিবে না। যে বলে ঈশ্বরের বাণী মানি না, সে ব্যক্তি অনেক অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে। তুমি বুদ্ধিকে গুরু করিবে? সেই পুরাতন গুরু অহঙ্কারী বুদ্ধি, তাহাকে ছাড়িবে না? ঈশ্বর যাহা বলিবেন, তুমি তাহা শুনিবে না? আমি কি তোমাকে চিনি না? তুমি বেদ উড়াইলে, শাস্ত্র উড়াইলে, আপনাকে আপনি পরিত্রাতা করিলে। পাছে তোমার পুরাতন দুষ্ট বুদ্ধি মারা যায়, পাছে তোমার অহংভাব চলিয়া যায়, পাছে ঈশ্বরচরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়, এই ভয়ে তুমি ঈশ্বরবাণী মানিতে চাও না। আচ্ছা দেশের বেদ আধুনিক পুরাণ তুমি মান না, দৈববাণী, বিবেকবাণী যোগের অবস্থায় যাহা আত্মার মধ্যে নিনাদিত হয়, গম্ভীর ভাবে উচ্চারিত হয়, সে

শব্দকে কেন মান না? শব্দই যে ব্রহ্ম। শব্দ নাই অথচ ব্রহ্ম, একি কথা? যে ঈশ্বর কথা কয় না, সে ত কল্পনা। তোমার মনের অহঙ্কার কি ঈশ্বর? অহঙ্কারের নাম তুমি ঈশ্বর রাখিয়াছ? যথার্থ ঈশ্বর কে? যিনি বলেন উঠ, বস, খাও, পড়, ধ্যান কর, একতারা বাজাও, এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সাধন কর, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর, উৎকৃষ্ট শ্লোকসকল চিন্তা কর, সাধুদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন কর। যাঁর মুখে এ সব কথা তিনিই ব্রহ্ম। যে কথা কয় না, সে ত ভূত প্রেত। আমাদিগের ব্রহ্ম কি ভূত প্রেত? ঐ দেখ, ঐ দেখ, কথা কহিল না, প্রেতত্ব সিদ্ধ হইল, ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ব্রহ্ম কথা কন, ব্রহ্ম ভূত ও প্রেত নহেন। নিঃশব্দতার মধ্যে তিনি উপদেশ দেন; অবাক্ হইয়া তিনি কথা কন। যাহারা অর্দ্ধেক ব্রহ্ম মানে, তাহাদের হস্ত হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্যবহারে যাহারা নাস্তিক, তাহাদিগের হস্ত হইতে যেন আমরা নিয়ত রক্ষা পাই। প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাকে আমরা বড় ভয় করি। এ নাস্তিকতাকে দূর করিয়া দাও। মান, এখনই মান, ঈশ্বরবাণী মান। ঈশ্বরের নিকট উপদেশ শ্রবণ কর। নীতি উপদেশ সকল ঈশ্বরপ্রমুখাৎ শ্রবণ কর। বল, যাহা তিনি বলিবেন তাহাই করিব। যে আসনে বসিয়াছ সে আসন হইতে উঠিবে না, যত ক্ষণ না তিনি আদেশ করিবেন। কোন কার্য্য তাঁহার আদেশ ব্যতীত করিবে না। তুমি মনুষ্য একটি তৃণ নাড়িবার

তোমার অধিকার নাই। যত ক্ষণ না মহাপ্রভু বলিবেন, যত ক্ষণ না কোন আদেশ করিবেন, তত ক্ষণ কিছুই করা হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর না আদেশ করেন, পাঁচ বৎসর এই স্থানে বসিয়া থাকিতে হইলেও থাকিবে। তিনি বলিবেন খাও, তবে আমি খাইব। খাওয়াও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সমাধা করিব। তিনি না বলিলে, সংসারের কোন কার্য্য করিতে পারিব না। কে যায় কর্য্যালয়ে ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত? যে টাকা উপার্জ্জন করে ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত, ঈশ্বরাদেশ না পাইয়া যে কাজ করিতে যায়, সে নাস্তিক। এক পয়সা যে ঈশ্বরের অনভিপ্রায়ে উপার্জ্জন করে সে নাস্তিক। কে যায় বিদ্যালয়ে উপাধি লইবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত? ঈশ্বরাদেশ না শুনিয়া বিদ্যালয়ে যায় যে যুবা সে নাস্তিক। ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারে রবিবারে ঈশ্বরের আজ্ঞা না শুনিয়া যে ব্যক্তি আগমন করে, সে নাস্তিক। এই সকল নাস্তিক কি পূর্ব্বাঞ্চলে কি পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই নাস্তিকতার আগুন যেন জীবকে দগ্ধ না করে, এই হৃদয়ের প্রার্থনা।

ঈশ্বরের ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি।

রবিবার, ৮ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক।

ঈশ্বরের বাহ্যিক লক্ষণ ও লীলা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে, কিন্তু যিনি অনন্ত, তিনি সদা অপরিবর্ত্তনীয় থাকেন।

অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াও তাঁহার ক্রিয়া অনুষ্ঠান এবং লীলাকে সর্ব্বতোভাবে বিচিত্র করেন। তাঁহার স্বরূপ এবং আখ্যা এক থাকিয়াও ভিন্নতা দেখায়। যদিও অনন্তের ভিতরে ব্রহ্মপ্রকৃতি আছে, সময়ে তাহা প্রকাশ পায়, এ জন্য অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ব্রহ্ম যিনি তিনি নির্গুণ, অটল, অচল, অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহাতে দিবা নাই, রাত্রি নাই, বর্ষা নাই, বসন্ত নাই; যৌবন নাই, বার্দ্ধক্য নাই, পুরুষের ভাব নাই, স্ত্রীর ভাব নাই; তিনি এক ছিলেন, এক আছেন, এক থাকিবেন। অনন্তে বিকার নাই, অনন্তের এক স্বভাব। তাঁহার বাহিরের লক্ষণের দিকে ফিরিলে তাঁহার কার্য্য প্রকারান্তর হইবে, বর্ণের পরিবর্ত্তন হইবে, ভিন্নতা হইবে, ভাবান্তর হইবে। এ সকল বাহিরে হয়। দেখ এই কয়েক দিন পূর্ব্বে বাঙ্গবাসিগণ দুর্গাকে নমস্কার করিল, পূজা করিল। তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল, প্রাণকে মোহিত করিল, তাঁহার রূপে হিন্দুর ঘর আলোকিত হইল, তাঁহার কাছে বসিয়া তাহার চিত্তের ভাবান্তর হইল। সকলে প্রণত হইয়া তাঁহাকে অঞ্জলি দিল। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সিংহবাহিনীকে অন্যবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সকলে পূজা করিতে লাগিল। এখন সুন্দরবর্ণ কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল। লোকে সুন্দরী দেবীকে পরিবর্জ্জন করিয়া কালী দেবীর পূজা করিতে গেল কেন? কি সেই রুচি যে রুচি

দুর্গাকে ছাড়িয়া কালীপদে ভূমিষ্ঠ হয়। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে অবশ্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে তাহা বুঝা আবশ্যক। মানুষ দুর্গাকে ছাড়িয়া কালীর নিকটে গমন করিল কেন? দুর্গাদাস আপনাকে কালিদাস কেন বলিল? মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্বভাব ও মতি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন। দেবীপ্রকৃতি একই। যিনি দুর্গা তিনিই কালী। শক্তি এক। যিনি পূজা করিলেন, তিনি দুয়েতেই শক্তি দেখিলেন। কিন্তু যাঁহাতে এত আকর্ষণ ছিল, যাঁহাকে দেখিলে মন মোহিত হইত, তাঁহার রূপান্তর দেখিয়া ভয় হয় কেন? আনন্দ হয়, ভয় হয়, এ দুই ভাব কোথা হইতে আসিল? এ দুই মনেতেই আছে। কেবল মনের ভাব দেবীকে দুই বর্ণে প্রতিফলিত করিল। যখন ভালবাসাকে লইয়া পূজা নমস্কার করিলে, আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অভয়াকে ভক্তি দান করিলে, তখন এক বর্ণ বিশ্বাসী নয়ন দর্শন করিল; কিন্তু যখন ভয়ে ভীত হইয়া দেবীকে দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, সে সময় সেই নয়নই অনন্তকালের ভিতরে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বিরাজমানা দেখিতে পাইল। ভাবে সাদা কাল হয়। দুর্গার সোণার রূপ ছিল, ভয় দুর্গাকে কাল করিল। শক্তি একই রহিল, কিন্তু দর্শনভেদে দেবীর ভাব বাহিরে ভিন্ন হইল। প্রকাণ্ড এক শক্তি, তাঁহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মীশ্রী, এক পার্শ্বে জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতী। পার্শ্বে সুন্দর বীর সন্তান, অপর দিকে মঙ্গল ও

বিঘ্নহরণ। দেখিতে দেখিতে চারি মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল, না আছে সখী, না আছে সন্ততি। এক ভয়ঙ্করা করালবদনা বাহির হইল। সে শ্রী নাই, সে রূপ নাই, সে প্রেম নাই, সে স্নেহ নাই, সে আমোদ নাই, সে উল্লাস নাই, এমন কাল যে ঘরে আলোক না থাকিলে অন্ধকার মধ্যে এ দেবীকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করা কঠিন। অন্ধকারে অন্ধকার মিশাইয়া গিয়া ক্রমে এক হইয়া গেল। যিনি দুর্গা ছিলেন, যিনি সখী ও সন্তানদ্বয় লইয়া দেখা দিয়াছিলেন, তিনিই রূপান্তর হইয়া গেলেন। আবার যখন ইচ্ছা প্রবল হইবে, তখন পুনরায় তাঁহাকে উপাসক দেখিতে পাইবেন। এখন সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া আর এক মূর্ত্তি উপস্থিত। ইহাঁর গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ, একটা বিকটাকার ভয়ানক মূর্ত্তি, দেখিয়া মনুষ্যের হৃদয় কম্পিত হয়। যে মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বে ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছে, মন মুগ্ধ হইয়াছে, সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিয়া এখন ভয় উপস্থিত। এ মূর্ত্তি কোথায় দেখিবে, ভক্তিপূর্ব্বক শুন। এক বার হৃদয়ের মধ্যে যাও, সেখানে খুঁজিলে এ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ভিতরে আলোক নাই, অন্ধকার তোমাকে পরিবেষ্টন করিবে। অনন্ত আকাশ কাল, সেই অনন্ত আকাশে বিলীন এই শক্তি। এখানে অন্ধকারে অন্ধকার এক, নিরাকারে সকলই একাকার হইয়া গিয়াছে। আকাশ ও অন্ধকারে কিছুই প্রভেদ করা যায় না। সেই ঘন কাল আকাশের ভিতরে,

অন্ধকারের ভিতরে, ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে তাঁহারই কালীমূর্ত্তি, দেবী বাহিরে, অন্তরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। হৃদয়ে সময়ে সময়ে বিশ্বাসনয়নে অন্ধকার, নির্ব্বাণ ও আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন হৃদয় পাপে আচ্ছন্ন হয়, তখন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই অশান্তির সময়ে মনে বড় ভয় উপস্থিত হয়। সেই ভয়ের মধ্য হইতে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বাহির হইয়া জীবগণকে কম্পিত করে। সেই ভীষনরূপা দেবী অনন্তকালরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া জীবগণের মস্তক ছেদন করেন। এই কাল অস্ত্রের আঘাতে কত মুণ্ড উচ্ছিন্ন হইল, কত বংশ বিলুপ্ত হইল। কাল অস্ত্র ধারণ করিয়া যিনি ছেদন করেন তিনি কালী। সেই কালীকেই সকলে মা বলে। কাল যাহাদিগকে মারিল, তাহাদিগের ছিন্ন মস্তক লইয়া মুণ্ডমালা করিয়া কালীর গলায় পরাইয়া দিল। কি জন্য? জীবকে ভীত করিবার জন্য। শক্তির এরূপ মূর্ত্তির অভিপ্রায় এই, জীবকে ভীত করিয়া পরলোকের সম্বল করিয়া দেওয়া। ভীত না হইলে জীবের অর্দ্ধ অংশ পাপে ডুবিয়া যায়, কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না। তুমি বলিতেছ, কৈ কোথাও ভয় নাই। প্রেমের চন্দ্র আকাশে উদিত, ভয়ের কারণ কোথায়? ভয়ের বস্তু কি কিছুই নাই? ঈশ্বর রাজা ইহা মান? ঈশ্বর রাজা হইয়া দণ্ড দেন, পাপীর বিচার করেন, শাস্তি বিধান করেন, শাস্তি দিয়া পাপীর পাপ নিবৃত্ত করেন। শক্তির এক মূর্ত্তি

অতি মনোহরা, আর এক মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা। এই ভীষণমূর্ত্তি দেবীর তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমস্ত পৃথিবীর অনিত্য বস্তু সংহার করিতেছে। এই অস্ত্র কত মুণ্ড ছেদন করিতেছে অন্ত নাই। কাটা মুণ্ডের মালা পরিয়া এই মূর্ত্তি ভয়ানক হইয়াছে, ছিন্ন মস্তকে ঘোরাল হইয়াছে। জীব অসার অনিত্য সংসারে মত্ত হইয়া আছে, প্রতিদিন অনন্তকালরূপ তীক্ষ্ণ অসি সুখ সম্পত্তি ধন ঐশ্বর্য্য বিনাশ করিতেছে, সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিতেছে। লক্ষ্মী সরস্বতীকে লইয়া দুর্গা সম্পদ দেন, জ্ঞান দেন। তোমার আমার মা হইয়া ঘরে লক্ষ্মী শ্রী আনিয়া দেন। মা কেবলই ভালবাসেন, এইরূপ আলোচনা করিয়া মাকে ছাড়িয়া অনিত্য সম্পদের উপরে লোকে প্রেম স্থাপন করে; সংসারের বিষয়সুখের উপর মায়া স্থাপন করে। ব্রহ্মশক্তি দুর্গা হইয়া সমুদায় সংসারে মঙ্গল কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন। মঙ্গল ও কল্যাণ আর দুর্গা এক। যিনি সরস্বতী তিনিই জ্ঞান বুদ্ধি, যিনি লক্ষ্মী তিনিই শ্রী সম্পত্তি। যাই লোকে দুর্গাকে ভুলিয়া গিয়া পাপে মজিল, সুবুদ্ধি ছাড়িয়া কুবুদ্ধি অনুসরণ করিল, লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া অলক্ষ্মীর শরণাপন্ন হইল, তৎক্ষণাৎ মহাদেবী কালী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নয়ন ঘুরিতে লাগিল, বিশাল খড়্গ উত্তোলিত হইল, করাল বদন প্রকাশিত হইল। তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া, শাণিত অস্ত্র দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত। আজ চারি দিকে ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকারের

মধ্যে মুণ্ডমালার ভয়ঙ্কর প্রকাশ। যেমন আপনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তেমনি ঘোর অমাবস্যা তাঁহার পূজার সময়। বাহিরে ভয়ানক অন্ধকার। সেই বাহ্যিক অন্ধকারের মধ্যে ঘোর ঘটা করিয়া সকলে কালী পূজা আরম্ভ করিয়াছে। কালীর কৃষ্ণবর্ণে অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়াছে। কাল সময়ে কাল দেবী আমাদের কাল হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন। কাল কাল কাল, সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ। সকলই কালতে মিশ্রিত, যেন ভাল কিছুই নাই। মন পাপে কাল হইয়াছে, অবাধ্য হইয়াছে, হৃদয় কলুষিত হইয়াছে, এমন অবস্থায় কালী প্রকাশিত হইলেন। দেহ কম্পিত হইল, মন কম্পিত হইল। অমাবস্যাসময়ে শ্মশানের মধ্যে ছিন্নমস্তক স্মরণ করিলে কার না ভয় হয়? দেখ, সম্মুখে ছিন্ন মস্তক হাতে লইয়া, মুণ্ডমালা গলায় পরিয়া খড়্গহস্তে দেবী প্রকাশিত হইলেন। পদতলে শম্ভু শবাকার হইয়া পড়িয়া আছেন। জীব আপনার পাপ বুঝিতে পারে না, তাই তাহার পাপ বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মের শক্তি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছেন। এ সময় সুখের সময় নহে। যখন সুখের সময় ছিল, পৃথিবী চমৎকার জ্যোৎস্নায় আলোকিত ছিল, তখন লক্ষ্মীর সময় ছিল। সে সময়ের আলোক মলিন হয় না, ম্লান হয় না। চারি দিক দেখ আজ ঘোর অন্ধকারের আবাস হইয়াছে। কাল রাত্রি আসিয়া উপস্থিত, আর জ্যোৎস্না নাই। সকলের মন প্রসন্ন

ছিল, মুখ প্রফুল্ল ছিল, এখন ভয়ে ম্লান। সকলকে ঘোর অমাবস্যায় ঘেরিয়াছে। লক্ষ্মী যে শক্তি, কালীও সেই শক্তি, কিন্তু সেই সাদা মূর্ত্তি কাল হইল কেন? এ যে ব্রহ্মের রুদ্রমূর্ত্তি! অধর্ম্ম দেখিয়া ধর্ম্মরাজ কালীমূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন। যেখানে পাপ সেখানে ভয় থাকিবে, সেখানে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার দেখা দিবে। সেখানে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি দিবে। জীব, মনে করিও না তোমার ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমায় সুখ দিবেন, তোমার হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা চাঁদ বিরাজ করিবে, তুমি এক বারও অমাবস্যা দেখিবে না। স্মরণ কর, আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র চির দিন থাকে না, এক দিন অমাবস্যা আসিয়া সমুদায় অন্ধকারে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। যে দেশে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রতি ভক্তি, সেই বঙ্গদেশেই কালীমূর্ত্তির অর্চ্চনা। দুর্গার মুখ দেখিয়াছ বলিয়া কদাপি কালীর মুখ ভুলিও না। কালীমূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা পাপহৃদয়কে কম্পিত করে। যিনি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাঁহারই ভিতরে দুর্গাও আছেন, কালীও আছেন। যিনি অনন্ত মঙ্গলময় ব্রহ্ম, তাঁহারাই মধ্যে সেই রুদ্রমূর্ত্তি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। সেই ব্রহ্মই এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন, যাহা দেখিবামাত্র ভয় উপস্থিত হয়। এ মূর্ত্তি এমনি যে সাধুকেও ভীত করিতে পারে। ভাবুক হিন্দুহৃদয় এই মূর্ত্তিকে বাহিরে কালীরূপে

সংস্থাপন করিল। কালের ঘোর কাল রং দিয়া অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের সঙ্গে উহাকে মিশ্রিত করিল। হিন্দুর উদ্ভাবিত এই মূর্ত্তিকে জ্ঞানচক্ষে অবলোকন কর। দেখিবে এই মূর্ত্তি শাস্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ। আমাদিগের মধ্যে ভক্তি শীঘ্র আসিতে পারে না, কিন্তু ভয় শীঘ্র আসিতে পারে। পাপের বিষয় চিন্তা করিলে আমোদ হয় না, সুখ হয় না। এ জন্য ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, এবং সেই মার মূর্ত্তির ভিতরে স্বর্ণ প্রতিমা দেখিতে বাসনা হয়, অন্ধকারময় দেবীকে মনে স্থান দিতে প্রবৃত্তি হয় না। অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকারবর্ণা দেবী অতি শীঘ্র দেখা যায় না। অন্ধকারের ভিতর হইতে দেবীকে যত টানিবে, তত তিনি অন্ধকারের ভিতরে মিশিয়া যাইবেন। হে সাধক, আরও চিন্তা কর, আরও স্মরণ কর, দেখিবে অন্ধকারের ভিতরে দেবী দেখা সহজ নহে; অন্ধকার অন্ধকার মূর্ত্তিকে আপনার ভিতরে টানিয়া লয়। কৃষ্ণবর্ণা দেবীকে কেহই অন্ধকার হইতে সমুৎপন্ন করিতে পারে না। মনে করিলে, ঈশ্বর কেবল সেই দেবীকে প্রকাশ করিতে পারেন। ঈশ্বর যখন এই ঘোরা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি প্রকাশিত করেন, তখন উহা দেখিয়া পাপী ভয়ে ভীত হয়। পাপ ছাড়িতেই হইবে। পাপের উপরে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ পড়িবে। কালীর সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অসুরকে বিনাশ করিবে। সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে স্মরণ কর। ভয়ে ত্রস্ত হইয়া দেবী কালীকে হৃদয়ে দর্শন কর। অসার

মৃত্তিকা লইয়া সে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। অকপট হৃদয়ে ব্রহ্মের দিকে নিরীক্ষণ কর, পাপীর প্রতি তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। নয়নকে আরও স্থির করিয়া রাখ, দেখিবে তিনি শাণিত অস্ত্রে অসুর বধ করিতেছেন। যত নিরীক্ষণ করিবে, তত অসুরের প্রতি, তাঁহার নিষ্ঠুর ভাব তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবে। ঘোর পাপ অমাবস্যায় আচ্ছন্ন হৃদয়ে সেই ঘোর কাল মূর্ত্তি প্রকাশিত, আর হাসিও না। এত কাল ছিলে ব্রহ্মদাস, তার পরে প্রেমে হইলে হরিদাস, এখন ভয়ের সময়ে আমাদিগকে কালিদাস হইতে হইবে। যখন যে ভাব, তখন সেই ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিবে। প্রকৃত ধর্ম্ম সময়োচিত ভাব আনিয়া উপস্থিত করে। তুমি এখন হরির ভাবে প্রমত্ত। হরিকে নমস্কার কর, বন্দনা কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর। তোমার জীবনে এখন বসন্তের সময়। এখন তুমি বসন্তোৎসব কর, হরিকে লইয়া প্রেমের মহোৎসব কর। হরির মর্য্যাদা রক্ষা কর, প্রেমে মত্ত হইয়া হরিদাস হইয়া প্রেমের গৌরব বৃদ্ধি কর। কিন্তু মনে করিও না, তুমি এখন হরিদাস আছ, হরিকে ভক্তি করিতেছ, তাঁহার পূজায় আনন্দিত হইতেছ, ইহা বলিয়া হরি তোমাকে কেবলই প্রেমে মাতাইবেন, কখন শাস্তা হইয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবেন না। আজ তুমি মিথ্যা কথা বলিলে, অপরের অনিষ্ট করিলে, পরদ্রব্য অপহরণ করিলে, কামাদি পরতন্ত্র হইয়া হৃদয়কে অপবিত্র করিলে,

দেখিবে তোমার হরি তোমার নিকটে বিদায় লইতে চেষ্টা করিতেছেন, আর ভাবিয়া চেষ্টা করিয়া কেবল ভক্তিসাধন করিতে পারিবে না। যত পার পাপ চাপা দাও, কিন্তু কিছুতেই আর উহা লুকাইয়া থাকিবে না। শাক্ত না হইয়া ভক্ত হইয়াছি, এখন ভক্ত হইয়া শাক্ত হইব। হরিদাস হইয়া জীবন শেষ করিতে যত্ন করিব, সঙ্কীর্ত্তন করিব, হরিনাম করিব, কিন্তু সময়ে সময়ে শাক্ত হওয়া উচিত; শাক্ত না হইলে হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। কপট ভক্তিতে পাপ চাপা দিবার কৌশল করিলে কি হইবে? পাপ মহিষাসুর যখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা শান্তি ভঙ্গ করিবেই করিবে। ঈশ্বরনিয়মের গতিতে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভয় আসিয়া কালীপদে তোমাকে অবনত করিবে। এ সময়ে তোমাকে রক্ষাকালীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, কালী কালী কালী কালী উচ্চারণ করিতে হইবে। এখন ধর্ম্মের সুখ প্রাপ্ত হওয়া প্রেমে প্রমত্ত হওয়া অসম্ভব। পাপ করিবে অথচ প্রেমের সুখ কেন পাইবে? খোল করতাল বাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পাপ ঢাকিবার চেষ্টা বৃথা। এখন মন শাক্ত, শক্তি চাই, বল চাই অস্ত্র চাই। দেবীর বলে শক্তি পাইয়া পাপাসুরকে চূর্ণ করিব। তাই বলি সকলে ব্রহ্মের রুদ্রমূর্ত্তির পদাশ্রিত হও, দেববলে স্বর্গীয় বলে বলী হইয়া পরাক্রম অবলম্বন করিয়া মার মার শব্দে পাপ চূর্ণ কর। অমাবস্যা শেষ হইলে আবার আলোকের সমাগম হইবে,

পূর্ণলক্ষ্মীর উদয় হইবে। দেবীপূজার সময় আছে, হরি-পূজার সময় আছে। সময় অবস্থা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক এক সময়ে এক এক পূজা করিতে হইবে। বঙ্গবাসীদের মত বাহিরে মাটির পুতুল গড়িও না, যখনিই দেবীর পূজা করিবে, আধ্যাত্মিক দেবীর পূজা করিবে। বিবেকের অস্ত্র ধরিয়া বিশ্বাসের খড়্গ লইয়া পাপ অসুরকে মার, ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্র পাপাসুরের গলায় পড়িবে। যখনই পাপ হইবে, ভয়ের সহিত ঈশ্বরের কাছে যাও, ভয়ে ভজন কর। ভয়ে অসুর বধ করিয়া নির্ভয় হও। মার অভয়পদে আশ্রয় লইয়া রামপ্রসাদের শক্তিভক্তি লাভ কর, শক্তি ও ভক্তি এক করিয়া নূতন প্রকারে ধর্ম্মে মনকে মোহিত কর। হে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম, নিরাকার মহাকালীর রূপ স্মরণ কর, *দেবীপদে পূজা উপহার অর্পণ কর, অভয়পদ প্রাপ্ত* হইতে চেষ্টা কর, নববিধানের এই মন্ত্র, এই তন্ত্র, এই শাস্ত্র।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন।

রবিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রহ্মসাধক, একখানি দুর্গা প্রতিমা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনার সম্মুখে স্থাপন কর। সেই পুতুল সম্মুখে রাখিয়া যোগের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডে তাহাকে স্পর্শ কর; সেই দণ্ড স্পর্শমাত্র দেখিবে প্রতিমাতে যাহা

কিছু ভৌতিক আকাশে বিলীন হইয়া গেল। উপরে শ্রী মূর্ত্তি, মধ্যে দুর্গা মূর্ত্তি, পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। যোগবলে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই তিন মূর্ত্তিকে দেহশূন্য মৃত্তিকা-বিবর্জ্জিত ভৌতিকলক্ষণবিরহিত করিয়া অধ্যাত্ম চক্ষে ধারণ কর। মাটীর দুর্গা পড়িয়া গেল, পবিত্র অধ্যাত্ম দুর্গা উঠিল। অসার মাটী উড়িয়া গেল, ভিতর হইতে জ্যোতির্ম্ময় সার সত্য বস্তু দেখা দিল। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী তিন ছিল, মহেশের ভিতর হইতে তিন উত্থিত হইয়া তিন এক হইয়া গেল। যেমন এক তিন হইয়াছিল, তেমনি তিনে এক হইল। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই ত্রিমূর্ত্তি এক হইয়া সাধকের হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। তিন মূর্ত্তিতে তিন ভাব প্রকাশিত হইল। এক মহেশ্বরী দুই সখী কোমল হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া উল্লাসিত করে। তিন ঈশ্বর বা তিন ঈশ্বরী নহে। এক ঈশ্বরীই তিন ভাবে হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলেন। যখন দুর্গা আসেন তখন লক্ষ্মী সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া কখন একা আইসেন না। দুর্গা পূজা করিলে, অথচ লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা করিলে না, ইহা হয় না। তিনকে লও নতুবা কাহাকেও লইও না। যদি সকলকে না লও, অকল্যাণ আনিবে। পূর্ণ পূজা করিতে হইলে দুর্গাকে তাঁহার সখী দুই জন সহ বরণ করিতে হইবে। তুমি, তোমার স্ত্রী, ভাই ভগিনী, পুত্র কন্যা, সকলে মিলিয়া সখী সহ দুর্গার পূজা কর। তিন মূর্ত্তির

তিন ভাবের অর্থ না করিলে কি প্রকারে সার বস্তু পাইবে? কঠোরপ্রকৃতি হইয়া পৌত্তলিকগণকে নির্ব্বোধ বলিলে, আধ্যাত্মিক ভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পূজা না করিয়া তাহারা অকল্যাণ আনয়ন করিল বলিয়া ঘৃণা করিলে, কিন্তু বল তুমি কি করিলে? তুমি তিন ভাবকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কি অকল্যাণের কার্য্য করিলে না? প্রতিমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুই সখীকে বিদায় করিয়া দিলে, মধ্যে যে মঙ্গলের মূর্ত্তি আছে, যিনি পাপাসুরকে বিনাশ করিতেছেন, তাঁহাকে ঘরে আনিলে, ভাবিও না যে তুমি ইহাতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিবে? তুমি মনে করিলে, বিদ্যা এবং বুদ্ধি মহেশ্বরের শক্তি। যে ঘরে ঈশ্বরের এই শক্তি বিরাজ করে, সে ঘরে টাকা ধন ধান্য থাকিলে তাহারা চলিয়া যাইবে। যেখানে ঈশ্বরের ধনধান্যবিধায়িনী শক্তির পূজা হইল, সেখানে মূর্খতা ডাকিয়া আনা হইল, বুদ্ধি স্থূল হইল। যেখানে লক্ষ্মীর পূজা, সেখানে যদি সরস্বতীর মন্দির নির্ম্মিত হয়, পণ্ডিত শাস্ত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া সমুদায় শাস্ত্র জলে ফেলিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি টাকা উপার্জ্জন করে, ধনাঢ্য, তাহার ঈশ্বরের দিকে অনুরাগ কি প্রকারে হইবে? সে ব্যক্তি ধনের অহঙ্কারে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে রক্ষা করিবে? রাস্তার ভিখারী বৈরাগী ইহাদের ঘরে লক্ষ্মী নাই, কিন্তু ঈশ্বর আছেন। সর্ব্বত্র দেখা যায়, ধন ধর্ম্মে মিল নাই। পৃথিবীতে সকলের এই সংস্কার, ধনী

হইলে সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। তাই ধন উপার্জ্জন করিতে গিয়া পুণ্য যায়, ধনী হইয়া লোকে ঈশ্বরকে ছাড়ে। আবার দেখ সরস্বতী ও লক্ষ্মী ইহাদিগের মধ্যে চির বিবাদ। বিদ্যা ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, লক্ষ্মী তত সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যান। ঘরে ধন অনেক আন, দেখিবে সে গৃহের যুবকগণ মূর্খ হইবে। ঘরে প্রচুর টাকা থাকিলে বিদ্যা উপার্জ্জনের আবশ্যকতা কেহ বুঝিতে পারে না। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এ কথার সাক্ষী। যত ধন বাড়ে, তত লোকে ভাবে বিদ্বান্ হইয়া কি হইবে? যাহার ধন আছে, তাহার সাহিত্য গণিতে কি হইবে? যে জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন, যাহা সঞ্চয়ের জন্য বিদ্যা উপায়, সেই ধন যদি ঘরে থাকিল তবে আর বিদ্যাতে প্রয়োজন কি? লক্ষ্য সিদ্ধি হইলে কে আর উপায়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে। যে পরিবারে ধনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে মন্দিরে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে, সেখানে সরস্বতীর মন্দির কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। সে পরিবারে সরস্বতীর আদর হইবার সম্ভাবনা নাই। ধন সম্পদ যেখানে সমুদায় বাসনা পূর্ণ করিতেছে, যখন যে কামনা উপস্থিত হয়, ধনদ্বারা তখনই তাহা সম্পন্ন হইতেছে, সেখানে আর কামনার বিষয় কিছু রহিল না, পড়াশুনা করিয়া কি হইবে? লোকে বলিয়া থাকে, এক দ্বার দিয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলে আর এক দ্বার দিয়া সরস্বতী পলায়ন করেন। লক্ষ্মী বা সরস্বতী কেহ

কাহার মুখাবলোকন করেন না। গরিব দুঃখী যাহাদের অন্ন সংস্থান নাই, বিদ্যা তাহাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, বহু গ্রন্থ পাঠ করিলে, সে কখন ধনে সুখী হয় না, ধনী সন্তানেরা এরূপ ভাবিয়া বিদ্যার পূজায় বিরত হইল। লক্ষ্মীর শিষ্যগণ সরস্বতীকে বিদায় করিয়া দিল। কোন দেশে যদি অধিক ধন সঞ্চয় হয়, সরস্বতীর অনুচরগণ মনে করেন, সে দেশ শীঘ্র সরস্বতীর অকৃপার পাত্র হইবে। ধন ক্রমে ক্রমে যত বাড়িবে, দেশ তত বিদ্যাবিহীন হইবে। অন্য দিকে আবার যদি বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, পাঠাভ্যাসে ক্রমান্বয়ে অনুরাগ বাড়িতে থাকে, কিসে টাকা আইসে সে দিকে আর দৃষ্টি থাকে না। যেখানে বিদ্যার প্রতি এইরূপ অনুরাগ বাড়ে, সেখানে সন্তানগণ আর পড়া শুনা না করে, পিতা মাতা তাহার জন্য চেষ্টা করেন। কেন না মনে এই বিশ্বাস, সরস্বতীর প্রতি অনুরক্ত হইলে টাকার প্রতি অনুরাগ আসিতে পারে না। অধিক লেখা পড়া করিলে বা জ্ঞান শিক্ষা করিলে সংসারে ধন উপার্জ্জন হয় না, খাওয়া চলে না। যে ছাত্রের মন ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের ভিতরে পড়িয়া আছে, যাহার অন্য বিষয়ে আর জ্ঞান চৈতন্য নাই, লেখা পড়া যাহার নেশার মতন হইয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী তাহার বাড়ীতে কখন পদার্পণ করেন না, তাহার প্রতি অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এরূপে সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে যেখানে লক্ষ্মী আসেন, সেখানে

সরস্বতী আসেন না, যেখানে সরস্বতী আসেন, সেখানে লক্ষ্মী আসেন না। পড়া শুনা করিলে টাকা বাড়িবে, লেখা পড়া বাড়িলে টাকা কমিবে। চিরকাল লক্ষ্মী সরস্বতীর মধ্যে বিরোধ। আবার এ দুই জনেরই ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ। ঈশ্বরপরায়ণ হও, বিদ্যা বুদ্ধির পথে উহা কণ্টক হইবে। ভক্তিমান্ হইলে বিদ্যার প্রতি আর আদর থাকিবে না। শ্রীমদ্ভাগবত বুদ্ধিকে অবমাননা করেন। পণ্ডিত হইয়া যদি কেহ ভক্তিমান্ হয়, তবে তাহার মানের হানি হয়। কাশীতে ভক্তিপ্রচার অসম্ভব, বৃন্দাবনে কখন টোল স্থাপন হইতে পারে না। যোগাভ্যাস করিতে বিচার চাই, কিন্তু তাহাতে ভক্তি হইবে না। জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে গিয়া মন অহঙ্কারে স্ফীত হইল, আর ভক্তি চলিয়া গেল। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বাড়িলে আর কেহ ভজন সাধন ছাড়িয়া জ্ঞান উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্ম্মের পথে জ্ঞান ভক্তির শত্রু। যত মূর্খ হইবে, তত ভক্তি বাড়িবে। যত জ্ঞান বাড়িবে, তত নাস্তিকতা প্রবল হইবে। যেখানে ব্যাকরণের অধিক আড়ম্বর, সেখানে ধর্ম্মানুষ্ঠান উঠিয়া যাইবে। ভক্তসমাজে যদি কেহ বলে আমি জ্ঞানী বুদ্ধিমান্, তবে তাঁহাকে অভিমানী জানিয়া নাস্তিক অধম দুরাচার পাষণ্ড শব্দে সকলে ঘৃণা প্রকাশ করিবেন। জ্ঞানের অভিমান পরিত্যাগ কর, শাস্ত্র লইয়া বিচার করিও না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিও না, পুস্তকসকলকে নির্ব্বাসন করিয়া

দাও, চুপ করিয়া সাধন ভজন কর, তাহা হইলে ভক্তিধন উপার্জ্জন করিতে পারিবে। লেখা পড়া কর, ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হও, গ্রন্থ স্পর্শ কর, ঈশ্বর পলায়ন করিবেন। ভক্ত টাকা কড়ীর সম্বন্ধ রাখিতে বীতরাগ। ভক্ত টাকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন না, চাকরী করেন না, ব্যবসায় বাণিজ্য, ধনার্থ চেষ্টা, উত্তম সামগ্রী আহার, ধনের সহিত সম্বন্ধ ভক্তি পথে কণ্টক। যেখানে ধনের সমাগম, সেখানে ঈশ্বর কেন আসিবেন? যেখানে বেশভূষার সমধিক আড়ম্বর, সেখানে ঈশ্বর নাই। লক্ষ্মীর প্রবেশ, বিবেক ও ঈশ্বরের পলায়ন। হয়, সমুদায় ধন ছাড়িয়া ফকির হও, না হয় সংসারী হও। ধর্ম্মে এই প্রকারে তিনের মধ্যে চিরবিবাদ। তিনকে তিন মানিলে এই প্রকার হইবে। যদি ব্রাহ্ম হইয়া এই প্রকারে পৌত্তলিকতার দোষে দোষী হও, তবে ঘোরতর অখ্যাতি হইবে। দেবীমূর্ত্তি তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। যদি এই তিন মূর্ত্তির ভাব খণ্ড খণ্ড করিয়া ত্রিমূর্ত্তি স্থাপন কর, সেই খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তির একত্র সংযোগে এক মূর্ত্তি নিষ্পন্ন করিতে না পার, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দময়ের পূরণ হইল না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিন এক, তিনের মধ্যে বিবাদ তোমার কল্পনা। তোমার দুষ্ট বুদ্ধি তিনের হাতে খাঁড়া দিয়াছে, তিনের মধ্যে সংগ্রামের চেষ্টা তুমি করিয়াছ। ঈশ্বরের তিন ভাবের মিল আছে, সৌহার্দ্দ আছে। সহচরী সহ চির দিন সকলে দুর্গাপূজা করিয়াছে, শত্রুতা থাকিলে

এরূপ কেন হইবে? আচ্ছা যদি শত্রুতাই থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তিন এক সময় আসেন না এক জন আসেন গৃহে থাকিলে, আর এক জন আসেন বনবাসী হইলে? এক ঈশ্বরে তিনের মিলন হইয়াছে। যিনি ঈশ্বর তিনিই লক্ষ্মী তিনিই সরস্বতী, ঈশ্বর কখন লক্ষ্মী ছাড়া অলক্ষ্মী নহেন, জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন অবিদ্যা নহেন। দুর্গাকে স্থাপন করিতে হইলেই তাঁহার সখীদিগকেও স্থাপন করিতে হইবে। ভক্ত তিনেরই ভাব একত্র স্থাপন করেন। কৈলাস হইতে যখন দুর্গা নামিলেন, দেখ সহচরী তাঁহার সঙ্গে আছে। তিনের মধ্যে নিত্যকালের যোগ। দুর্গাকে ডাকিলে দুর্গতি নাশ হয়, জ্ঞান হয়, ধনসম্পদ্ হয়। বুদ্ধি যেখানে সম্পদ্ সেখানে। মনকে আলোকিত করিলে সমস্ত সংসার আলোকিত হয়। সরস্বতীর আগমনে লক্ষ্মীর আগমন, বুদ্ধি কখন লক্ষ্মীর বিরোধী নহে। ভক্তিশাস্ত্র যে বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি চটেন, সে বিদ্যা অবিদ্যা, সে বুদ্ধি কুবুদ্ধি। ভক্তিশাস্ত্র অবিদ্যাকে আক্রমণ করে, কুবুদ্ধিকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে যত্ন করে। যে পুস্তকে দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তাহা পাঠ করিও না। যাহা স্পর্শ করিলে নাস্তিকতার স্পর্শ হয়, সেই ভয়ানক বিষ স্পর্শ করিতে সংসারে সকলেরই ভয় হইবে। এই বিষ পরিহার করিবার জন্যই বুদ্ধিসম্পর্কে এত কথা। দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধি পরবশ সকলকেই হইতে হইবে। সুবুদ্ধি বলিল,

কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, কিন্তু তোমার ভাবনা উপস্থিত—কল্যকার জন্য চিন্তা না করিলে পরিবার সকলে আহার বিনা মরিয়া যাইবে। আমি বলি, তোমাতে দুষ্ট বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার জ্ঞানের মিলন নাই, জানিবে তোমাতে কুবুদ্ধি উপস্থিত। ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তাঁহার সেবা কর, কিন্তু তাহাতে কল্য কি খাইবে তাহা পাইবে না, যখন এই প্রকার চিৎকারধ্বনি উপস্থিত হয়, তখনই জানিতে পারি আমার ভিতরে এ সুবুদ্ধি নয় কুবুদ্ধি। সরস্বতী ছাড়াও আবার দুষ্টা সরস্বতী আছে, ইহা জানিয়া ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি হইতে কুবুদ্ধিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। এক বস্তু চলিয়া গেলে মন কখন শূন্য থাকিবে না। দুষ্টা সরস্বতী চলিয়া গেলে বুদ্ধি বিচার বিবেচনা সমুদয় আর সেরূপ থাকিবে না। এইরূপে ধর্ম্ম করিয়া যত দুঃখ হইতে হয় হউক, যত মানহীন হইতে হয় হউক, যত কষ্ট পাইতে হয় প্রাপ্ত হওয়া যাউক, তথাপি এইরূপে ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে এরূপ বুদ্ধি শুভ বুদ্ধি। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি যদি কুতর্কপরায়ণ হয়, তবে সে দুরাচারী। সরস্বতী দুই, এক ঈশ্বরের নিত্যসহচরী, আর এক ঈশ্বরের শত্রু। জ্ঞান যদি ঈশ্বরের বিরোধী হয়, তবে তাহা অজ্ঞান, অবিদ্যা, দুষ্টা সরস্বতী। জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতীর ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য মিল আছে। লক্ষ্মীও দুই,

এক ঈশ্বরের সঙ্গে চিরমিলিতা, আর এক ঈশ্বরের বিরোধিনী। ঈশ্বরের বিরোধিনী লক্ষ্মী অলক্ষ্মী। যেখানে টাকা আলস্য বৃদ্ধি করে, নানাপ্রকার অসদুপায়ে ধন উপার্জ্জিত হয়, সেখানে ধর্ম্ম নাই। সমুদায় দিন খুব টাকা উপার্জ্জন করিলে সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া উপাসনা করিতে পারিলে না, বাড়িতে আসিয়া সকলের প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলে। যিনি ঈশ্বরের লক্ষ্মীশক্তির অনুসরণ করিয়া ধন উপার্জ্জন করিলেন, তাঁহার এরূপ ভাব কখন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করিতে গিয়া ধর্ম্মবিরোধী হয়, বিরক্ত হয়, ক্রোধ পরবশ হয়, নির্যাতনে প্রবৃত্ত হয়, হিংসায় অধীর হয়, কুপ্রবৃত্তির অধীন হয়, সে কখন লক্ষ্মীপূজা করে নাই, অলক্ষ্মীর পূজা করিয়াছে। লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছেন এজন্য গৃহে টাকা আসিল সকলে স্বীকার করে, কিন্তু টাকার সঙ্গে সঙ্গে যে অলক্ষ্মীকে ডাকিয়া আনা হয়, ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না। যেখানে অধর্ম্ম কুনীতি প্রবল সেখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যখন লক্ষ্মী আইসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের ধর্ম্ম সমাগত হয়, সমৃদ্ধি খুলিয়া যায়। সমুদায় অসদ্বিষয় ছাড়িলে তবে লক্ষ্মী আগমন করেন। কল্যকার জন্য ভাবিও না, কিন্তু ধর্ম্ম ও স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তোমাদিগকে সকলই প্রদত্ত হইবে, এই কথা ঠিক হইল। 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' এই বিশ্বাসে সকল

দিক রক্ষা পায়, পৃথিবীর লোকেরা ইহা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইবে। এই সকল লোকের বুদ্ধি নয়, গণিত বিদ্যা, ইহারা কেবল গণনা করিয়া জীবনকে ভারগ্রস্ত করে। ঈশ্বরের হস্তে বিশ্বের ভার, ঈশ্বরের হস্তে প্রত্যেক সংসারের ভার। যে সংসারের ভার ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিল, সেই বৈরাগ্য পালন করিল। তাহার চক্ষু লক্ষ্মী সরস্বতী বিবেক। লক্ষ্মীর আবির্ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সে নিশ্চিন্ত হয়। সংসারে যে ব্যক্তি খুব বুদ্ধিমান, সে ব্যক্তি আগে সঞ্চয় করে। সঞ্চয় না করিলে লোকে তাহাকে অলক্ষ্মী দেখে। কিন্তু, হে ব্রাহ্ম, তুমি কেবল পূজা কর, পূজা করিলে তোমার মনে সুবুদ্ধি উপস্থিত হইবে। পৃথিবীর ভিতরে টাকার পথ দেখাইতে কেবল ঈশ্বরই পারেন। তিনি যে পথ দেখাইবেন তাহাতে নিশ্চয় লক্ষ্মীসমাগম হইবে। তোমার ঘর লক্ষ্মীর ঘর হইবে। লক্ষ্মী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইবেন। যত ভক্তি বৃদ্ধি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, তত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ হইবে। যত জ্ঞান বুদ্ধি বাড়িবে, তত ঈশ্বরে ভক্তি বাড়িবে। কখনও মনে করিও না বিষয়ে ফল নাই। যে গৃহে ঈশ্বরের পূজা হয়, দুর্গাপূজা হয়, সে গৃহে দুর্গার সখীদ্বয় আইসেন, এক জন জ্ঞান দেন, এক জন সম্পদ দেন। সংসারে টাকা যতটুকু হইলে সংসারের কষ্ট মোচন হয়, তৎসমুদায় অবশ্য যোগাইবেন। ঈশ্বর আপনার রাজ্য

সংস্থাপন করিবেন, তাঁহার রাজ্যে দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট কখন থাকিতে পারে না। লক্ষ্মী সর্ব্বদা ভক্তকে সহাস্য রাখিবেন, লক্ষ্মীভক্ত সর্ব্বদা অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমধিক লাভ করিবেন। প্রসন্ন-মুখ সর্ব্বদা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রকাশ করে। লক্ষ্মীর অনুগ্রহে যেমন সম্পদ লাভ করে, তেমনি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সরস্বতীভক্ত নৃত্য করে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র পরম মহেশ্বরের সঙ্গে প্রকাশিত হন। যাহারা সর্ব্বজনপরিত্রাতা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাঁহারা মুক্তি সঞ্চয় করে। তুমি অধ্যাত্ম নয়নে এই মূর্ত্তি দর্শন কর। চিন্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তোমার বিশ্বাস কমিল না আরও বাড়িল। জ্ঞানের আকারে ধন ধান্যের আকারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী তোমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। চিন্তাতে টাকাতে এখন আর কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরের পবিত্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্র কেবল হরির ছবি মার ছবি প্রকাশিত। কেমন হরির প্রেম সর্ব্বত্র দেখিতেছি, কেমন প্রেম তিনি দেখাইতেছেন। হরি সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন আর ভয় কি? মা যখন আসিলেন তখন দুঃখ ভাবনা সকলই চলিয়া গেল। লক্ষ্মী আপনি ভক্ত সন্তানগণকে পালন করিতে লাগিলেন। ভক্তে আর অলক্ষ্মী বা অবিদ্যা থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না। মা আপনি শত শত বুদ্ধি দিবেন। আমি মূর্খ স্বীকার করি, কিন্তু আমার মা বড় বড় দুর্ব্বোধ বিষয় আমাকে অত্যন্ত সহজে বুঝাইয়া দেন।

আমার বুদ্ধি আমার মাতা, আমাকে অন্যের নিকটে জ্ঞান শিখিতে হয় না। আমি যদি অন্যের নিকটে পুস্তক না পড়ি, আমার মা বিদ্যার জাহাজ, জ্ঞানের সমুদ্র, সেইখান হইতে এক বিন্দু লাভ করিলে আমার যথেষ্ট। আমি সামান্য ধন বা জ্ঞানের জন্য কেন ক্রন্দন করিব, সম্মুখে সমুদ্র থাকিতে কে তৃষ্ণায় কাতর হয়? পৃথিবীর নিকটে কোন ধন মানের আকাঙ্ক্ষা রাখি না, বিষয়ীর ন্যায় ধন উপার্জ্জনেও ব্যস্ত নই, যে উপায় ভাল, হরি তাহা আপনি করিয়া দিবেন। তিনিই পড়াইবেন, তিনিই বুদ্ধি দিবেন। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতে চাই না, তাঁহার বিদ্যালয়ে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত বিদ্যায় বিদ্বান্ হইব। ধন সম্পৎ শান্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা সকলই আমাদের তাঁহার নিকটে। বাজারের মহাজনদিগের ন্যায় আমরা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে চাই না, কোন ব্যবসায় করিতে চাই না, স্বয়ং হরি আমাদিগের সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ভক্তের ঘরে খাওয়া দাওয়া সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলা। ভক্ত কেবল হরির কার্য্য করেন, তাঁহার চরণ সেবা করেন, আর আকাশ হইতে তাঁহার গৃহে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া টাকা পড়িতে থাকে। ভক্ত কেবল জয়, হরির জয়, জয় হরির জয় বলিয়া যত নাচেন, যত হরিনামে মত্ত হন তত বিদ্যা ও ধন প্রাপ্ত হন, ঘরে বসিয়া তাঁহার সমুদায় বিষয়ে সুব্যবস্থা হয়। আইস সকলে মিলিয়া কেবল

হরিনাম করি, ব্রহ্ম নাম করি, তাঁহার চরণতলে প্রণিপাত করি, তাঁহাকে ডাকি, তাঁহার পূজা করি, ধন ধান্য বিদ্যা সকলই আমাদিগের হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিব।

সম্পূর্ণ।